ত্রিপুরার রূপকথা

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

ত্রিপুরার রূপকথা

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮০

পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৮-৯৯

মূল্য ঃ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) টাকা

মুদ্রণে ঃ
ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স
কৃষ্ণনগর
আগরতলা - ৭৯৯ ০০১

ভূমিকা

সবুজ বনানী ঘেরা ত্রিপুরার আদিবাসীদের অতীত সামাজিক দিকটার প্রতি প্রকৃত অর্থে দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ আগে আসেনি।

কোন সমাজ ও সভ্যতাকে ভালোভাবে জানতে হলে— সে সমাজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও অতীত ইতিহাসকে জানা দরকার। কিন্তু যেখানে প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে লিখিত কোন দলিল নেই বললেই চলে, সেখানে সে সমাজের লোকমুখে প্রচলিত লোকগাঁথাই গবেষণার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ বলে ধরে নেয়া অযৌক্তিক হবে না। সে ধরণের কিছু লোকগাঁথা সংগ্রহ করে এনেছেন শ্রীশান্তিময় চক্রবর্ত্তী। সে কারণে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথাগুলোর এই ক্ষুদ্র সমাহার আমরা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। এই গাঁথাগুলো যদি জ্ঞানপিপাসুদের সামান্যতম তেষ্টা মেটাতে পারে ও ভাবী নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় সত্যি সত্যিই উদ্বুদ্ধ করতে পারে— তবেই আমাদের গবেষণা কেন্দ্র কৃতার্থ হবে।

১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থটি পাঠক, গবেষক ও উৎসাহীদের কাছে দারুণভাবে সমাদৃত হওয়াতে, গ্রন্থটি অচিরেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাই এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বর্তমানে আবার প্রকাশিত করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি।

৩১-১২-৯৮ইং
আগরতলা।

অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র

সূচীপত্র

রক্ত পিপাসু দেবতা	৫
বানর বর	১০
পুরোহিত	১৬
উই পোকা স্বামী	২০
রাজহাঁসের কাহিনী	২৫
গুল্ম কুমারী	৩০
কথা বলো না	৩৬
বিচার	৩৯
মুরগীর পিঠে	৪৫
কথা বলা আংটি	৪৮
একফালি লাউয়ের গল্প	৫৪
ধনেশ পাখির গল্প	৫৭
স্বর্গের ফুল রান্না	৬০
সজারুর বুদ্ধি	৬৪
একটি মাছির গল্প	৬৬
সব কালাদের একঘর	৭০
প্রতিজ্ঞা	৭৩
ছাতিম গাছের কাহিনী	৮০
ছিপিংতাই—মাইরুংতুই	৮৫
অজগর সাপের গল্প	৯১
চাঁদের ছেলে	৯৯
কাঞ্চনমালা	১১০
নাঐ পাখির গল্প	১১৬

রক্ত পিপাসু দেবতা

আজ থেকে অনেক-অনেক বছর আগেকার কথা। ত্রিপুরা ভূমির এক রাজার নাম ত্রিলোচন। মা হীরাবতী। কিশোর ত্রিলোচন মা হীরাবতীর নয়নের মণি। হীরাবতী রাণী হলে কি হবে, ঘর-কন্নার সব কাজ নিজ হাতেই করেন।

বর্ষাকাল। নদীর ঘাটে জল আনতে গেছেন রাণীমা। তখনও সুর্যি ডুবেনি। নির্জন নদীর ঘাট। রাণীমা চান করে কলসী ভরতে যাবেন অমনি কারা যেন আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল 'রাণীমা, আমাদের বাঁচাও।' রাণীমা চমকে উঠলেন। চারদিকে চেয়ে দেখলেন। একবার। কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। আবার জল ভরতে যাবেন আবারও সেই করুণ আর্তনাদ "আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও রাণীমা।"

না - ভুল হয়নি। রাণীমা ঠিকই শুনেছেন। নদীর ওপার থেকেই ভেসে আসছে সেই কাতরধ্বনি। বারবার করুণ আর্তনাদ রাণীমাকে ভাবিয়ে তুলল। দেবতা, যক্ষ-রক্ষ,

গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ যেই হোক না কেন— কথার উত্তর দিতে হবে। তিনি শব্দ লক্ষ্য করে বললেন - "তোমরা কে? কোথা থেকে বলছ বুঝতে পারছিনা। আমি অনাথ বিধবা। আমাকে দিয়ে তোমাদের কি কাজ হবে জানিনা। তবু জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কে? পরিচয় দিয়ে আমার সন্দেহ দূর কর।" ওদিক থেকে সমস্বরে উত্তর এল— "রাণীমা, আমরা চৌদ্দজন দেবতা। একটা পাঁজি মোষ আমাদের তাড়া করে নিয়ে এসেছে। উপায় না দেখে প্রাণ বাঁচাতে শিমূল গাছে চড়েছি। মোষটা গাছে উঠতে পারছে না, তাই যা রক্ষে। একগুঁয়ে মোষটা গোড়া থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। ক্লান্তিতে এখন একটু ঝিমুচ্ছে মনে হয়। গাছ থেকে নামতে গেলেই শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। মোষটা নড়ছে না — আমরাও নামতে পারছি না। আজ সাতদিন আমরা কিছুই খাইনি। তুমি সৌভাগ্যবতী ত্রিপুরার মহারাণী সতীসাধ্বীও বটে। এ বিপদ থেকে তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার।"

রাণীমা দেবতাদের কথায় বললেন— "আপনারা নিজেদের দেবতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। অথচ কী আশ্চর্য, একটা মোষের ভয়ে গাছে চড়ে বসে আছেন! চৌদ্দজন দেবতা যেখানে হেরে গেলেন— যা পারেননি; আমি একা মেয়ে মানুষ তা কি করে পারবো? তাই ভাবছি, আমি আপনাদের কি করে বাঁচাব!" দেবতারা বললেন —"রাণীমা, সতী নারীর কিছুই অসাধ্য নেই। আমরা দেবতা, কখনও মিথ্যা কথা বলি মা। যা কিছু বলছি মন দিয়ে শোন। কোন এক অভিশাপে আজ আমরা মোষটার সঙ্গে পেরে উঠছি না। আমরা যা পারিনি তুমি তা করতে পারবে বলেই এ রাজ্যে ধেয়ে এসেছি। মোষটার কবল থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও। আমরা চিরদিন তোমার কাছে বাঁধা থাকব।"

রাণীমা জিজ্ঞেস করলেন— "এখন আমাকে কি করতে হবে দয়া করে বলে দিন। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

দেবতাদের মধ্যে একজন বললেন— "রাণীমা, তোমার 'রিছা' (বক্ষাবরণী) মোষটাকে দেখিয়ে পিঠে ফেলে দিলেই সে বাগে আসবে। তখন ওটাকে শিমূল গাছে বেঁধে বলি দিলেই আমরা নেমে আসব। এরপর তুমি আমাদের বাড়ী নিয়ে যেও।"

এতক্ষণে রাণীমার শংকা কেটে গেছে। তিনি দেবতাদের বললেন— "যদি আপনাদের কথা সত্যি হয়, আমি নিশ্চয়ই তা করব। যে ভাবেই হোক আমি আপনাদের বাঁচাব। আপনারা এখানে খানিকটা অপেক্ষা করুন। আমি বাড়ী থেকে লোকজন নিয়ে এক্ষুণি ফিরে আসছি।"

রাণীমা বাড়ী গিয়ে খানিক পরেই ফিরে এলেন। সাথে নিয়ে এলেন বিশ-পঁচিশজন অনুগত লোক। ওদের প্রত্যেকের হাতেই ধারাল অস্ত্র। বর্ষাকাল। বৃষ্টি হচ্ছে। তাই সবার হাতে পাতার ছাতা।

নদীর ঘাটে এসে রাণীমা ওপারের শিমূল গাছটা দেখিয়ে বললেন— "ও যে

ওপারের শিমূল গাছটা দেখতে পাচ্ছ তার ওপরেই দেবতারা রয়েছেন। গোড়াতেই মোষটাকে দেখতে পাবে। আমার রিছাটা দিচ্ছি। যে ভাবেই হোক রিছাটা মোষটার পিঠে ফেলে দেওয়া চাই। তাহলেই মোষটা বাগে আসবে— কাউকে তেড়ে মেড়ে আসবে না। এ সুযোগে মোষটাকে শিমূল গাছে বেঁধে বলি দেবে। বলি শেষে দেবতারা নেমে এলে পিঠে করে বাড়ী নিয়ে আসবে। কয়েকজন রাণীমার সঙ্গে রয়ে গেল। অন্যরা সবাই ছাতা মাথায় ওপারে চলল।

সঙ্গের লোকজনদের নিয়ে রাণীমা বাড়ী ফিরে এলেন। লোকজন দিয়ে বাড়ীর একটা ঘর নিকিয়ে চুকিয়ে দেবতাদের থাকার মত ঠাঁই করে রাখলেন।

ওদিকে নদী পেরিয়ে সবাই খুব ভয়ে ভয়ে শিমূল গাছটার দিকে এগুতে লাগল। কখন বিপদ ঘটবে কে জানে! আরও খানিকটা এগুতেই গাছের গোড়াতে ষণ্ডাটাকে দেখতে পেল। ঘুমিয়ে আছে সত্যি, কিন্তু কে এগিয়ে গিয়ে মোষটার পিঠে রিছাটা ফেলবে তা নিয়েই সমস্যা দাঁড়াল। খুব নীচুস্বরে শলা পরামর্শ চলতে লাগল। রিছাটা ফেলতে গিয়ে ষণ্ডাটা যদি টের পেয়ে যায়— তাহলেই তো এক গুতোয় ঠাণ্ডা করে দেবে। এ ঠেলছে ওকে, ও ঠেলছে তাকে। কারুরই সাহস হচ্ছে না। সবাই ছাপোষা মানুষ। কে যাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে। এদিকে ওদের কানাঘুসুতে মোষটা ঘুম থেকে উঠে এতগুলো লোক দেখে থমকে দাড়াল। দলের মধ্যে ছিল একজন বুড়ো মানুষ। সে ভাবল— যদি মোষটা এখন তাড়া করে আসে তবে কাউকে আস্ত রাখবে না। কপালে যাই থাকুক, এক্ষুণি কিছু একটা বিহিত করতে হবে। সাহসে বুক বেঁধে রিছাটা হাতে নিল সে। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"দোহাই চৌদ্দ দেবতার, দোহাই মহারাণী হীরাবতীর। যদি চৌদ্দ দেবতার কথা সত্যি হয়, যদি সতী সাধ্বী মহারাণী হীরাবতীর রিছার জলন্ত কীর্তি জগতে প্রচার হবার সম্ভাবনা থাকে— তাহলে এ রিছা আমি তোমার পিঠে ফেলতে আসছি, তুমি নিশ্চয়ই বাগে আসবে।"

এদিকে মোষটাও আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু যেইমাত্র রিছাটা দেখতে পেল অমনি হেঁট করে একেবারে ঘরপোষা মোষের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সুযোগ বোঝে লোকটাও মোষের পিঠে রিছাটা বিছিয়ে দিয়ে গায়ে হাত বুলাতে লাগল।

মোষটার ভাব দেখে সকলের মনেই রাণীমার কথায় বিশ্বাস হল। কিছু বাঁশের দড়ি পাকিয়ে সঙ্গে এনেছিল। এবার সকলে তা দিয়ে মোষটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। বাস, আর যাবে কোথায়!

বলি শেষে দেবতারা গাছ থেকে নেমে এল একে একে। মোষের রক্ত দেখে তাঁদের মনে সেকি আনন্দ! অনেকদিন উপোসের পর গরম গরম রক্ত! বেশ মজা করে খাওয়া গেল। এবার বাড়ী যাবার পালা। এক নাগাড়ে অনেকদিন উপোসে দেবতারা সামান্য পথ চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই একে একে সঙ্গের লোকজনদের পিঠে চড়ে রাজবাড়ীর পথে এগিয়ে চললেন দেবতারা।

আষাঢ় মাস। শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ সেই কখন ডুবে গেছে। মোষটা বলি দিতে গিয়ে রাতও হয়ে গেছে অনেক। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টিও পড়ছে। অন্ধকার পিচ্ছিল পথ বেয়ে চলতে লাগল একদল লোক— পিঠে দেবতা আর মাথায় পাতার ছাতা। সবার মুখে 'এ-ই—হোঁউ, এ-ই হোঁউ' শব্দ। পথ হারিয়ে যাতে দলছাড়া হয়ে না পড়ে তাই এভাবে শব্দকরে পথচলা।

পথ চেয়ে বসেছিলেন রাণীমা। দূর থেকে 'এ-ই—হোঁউ, এ-ই হোঁউ' শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন ওরা আসছে। ওদের এগিয়ে আনতে মশাল হাতে পাঠিয়ে ছিলেন কয়েকজনকে। খানিক বাদেই ওরা এসে গেল। রাজবাড়ীর উঠোনে দেবতাদের নামান হল। রাণী ভক্তিভরে দেবতাদের প্রণাম করলেন। মাঙ্গলিক কাজ সেরে এবার দেবতাদের ঘরে স্থাপন করা হল।

প্রতিদিন সেবা অর্চ্চনা চলতে লাগল। রাণীমা নিজ হাতে দেবতাদের অর্চ্চনা করেন। দেবার্চ্চনা না হলে তিনি জলটুকুও মুখে নেন না। ত্রিলোচনের তখন ছেলে বয়েস— ভালমন্দ ততটা জ্ঞান হয়নি। রোজ ভোর বেলা খাইয়ে দাইয়ে রাণীমা ছেলেকে দেবতাদের ঘরে পৌঁছে দেন খেলাধূলা করতে। দেবতারাও কুমারকে লুফে নেন। ফিরে এসে চান আহ্নিক সেরে রাণীমা হেঁসেলে ঢুকেন— দেবতাদের ভোগ তৈরী করতে। দুপুরবেলা দেবতাদের ভোগ নিবেদন হলে ফিরে আসার সময় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। পূজা শেষে মা-ছেলে দেবতাদের প্রসাদ পান। এভাবে দিন চলতে লাগল।

ছেলে দিন দিনই শুকিয়ে যাছে। রক্তহীন, ফ্যাকাসে ছেলের মুখ দেখে মা হীরাবতীর চিন্তার শেষ নেই। অজানা আশংকায় বুক দুরু দুরু করে উঠে। অসুখ-বিসুখ কিছু একটা দেখা যাচ্ছে না। মা একদিন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন —"আচ্ছা বাবু, তুমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? অসুখ বিসুখ করেনি তো?" ছেলে বলল "না মা, আমার কোন অসুখ করেনি। কিন্তু কেন জানি, খুবই দুর্বল মনে হচ্ছে। ভোরবেলা দেবতাদের ঘরে যখন যাই তখন বেশ থাকি। কিন্তু ফিরে আসার সময় খুব দুর্বল হয়ে যাই। হেঁটে আসতেও কষ্ট হয়। ছেলের কথায় রাণীমার চিন্তা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

দিনের পর দিন যাচ্ছে। যত্ন আত্তি সত্ত্বেও ছেলের শরীর ভাল হচ্ছে না। ভোরে এক —দুপুরে আর। আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন রাণীমা কি জানি কি ভেবে দেবতাদের ঘরের দিকে গেলেন ছেলেকে দেখতে। দরজা বন্ধ, ভেতর রা নেই। ভাবলেন — কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘরের খুব কাছে যেতেই ভেতরে একটা ফিসফিসানি শুনতে পেলেন। ভারী সন্দেহ হল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই চোখ ছানাবড়া। কী অবাক কান্ড! দেবতারা সবাই মিলে একটা পাঁঠা বলি দিলেন। কাটা মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে বেড়িয়ে আসা এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে ফেললেন না। সবটুকু চুষে নিলেন মজা

করে। তারপর মন্ত্র পড়ে খানিখটা জল ছিটিয়ে দিতেই কাটা পাঁঠাটা আবার মানুষ হয়ে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলেন-ত্রিলোচন। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন রাণীমা। রাণীমাকে দেখেই দেবতারা সবাই হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারো মুখ থেকেই রা বেরুল না।

রাগে দুঃখে রাণীমা নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। খুব কড়া কথায় বকতে লাগলেন দেবতাদের। সতী নারীর ক্রোধের কাছে দেবতারা একেবারে মিইয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন—"খুব বিশ্বাস করে ছেলেকে তোমাদের কাছে সঁপে যেতাম। কেননা, তোমরা দেবতা— সব আপদ বালাই থেকে তোমরাই তাকে রক্ষা করবে। আমার সাধ্যিমত তোমাদের সেবা যত্নের ত্রুটি করেছি বলে তো মনে হয় না। আজ কিনা তোমরাই আমার একমাত্র ছেলের রক্ত চুষে খাচ্ছ। দেবতা হয়ে এত করতে পারলে?"

লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিল দেবতারা। হেঁটমুখেই তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—"আর লজ্জা দিওনা রাণীমা। আমরা যে খুবই অন্যায় করেছি—তা সত্যি। কিন্তু কি করব! এ্যাদ্দিন লজ্জায় তোমাকে কিছুই বলিনি। আজ যখন সব দেখলে তখন খুলে বলাই ভাল। তাতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হবে।" দেবতা বলতে লাগলেন— "আমরা অমৃত পান করেও ততটা খুশি হই না, যতটা হই এক বিন্দু রক্তপান করতে পেলে।' রাণীমা মনে মনে ভাবছেন— 'সত্যিই তো, কি ভয়ানক ভুলই না হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই যদি দেবতাদের রুচি, পছন্দের কথা জেনে নিতাম তাহলেই চুকে যেত। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাণীমা করজোড়ে দেবতাদের বললেন— "আপনাদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করেছি বলে ক্ষমা করুন। আজ থেকে আপনাদের রুধির ভোগের জন্য রোজ একটা করে পাঁঠার ব্যবস্থা থাকবে। আপনাদের সেবা পূজোয় আরও কিছু ত্রুটি থাকলে কৃপা করে খুলে বলুন। আমি তা পূরণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

রাণীমার কথা শুনে দেবতারা সবাই খুব সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা প্রাণভরে রাণীমাকে আশীর্বাদ করলেন।

জয় রাণীমার জয়। জয় রাণীমার জয়। জয় রাণীমার জয়। ❑

বানর বর

শীতকাল। জুম তখনও শেষ হয়নি। বেগুন, তূলো এখনও রয়ে গেছে প্রচুর। বানর বেগুনগুলো খেয়ে ফেলতে পারে, তূলোগুলোও নষ্ট করে ফেলতে পারে— তুলে না আনলে। তাই মেয়েরা দল বেধে জুমে যাঁচ্ছে।

জুমে গিয়ে ওরা দেখল, একটা বানর জুমের ভাল ভাল বেগুনগুলো পেড়ে খাচ্ছে। মেয়েদের দলের সবচাইতে ছোট মেয়েটিরই চোখে পড়ল। সেই প্রথম কুকুর লেলিয়ে দিলে—'ছু-ছু-ছুলে - লেলে।' তার সাথে অন্য মেয়েরাও চীৎকার দিয়ে উঠল। কুকুরটা দৌড়ে গেল—কিন্তু অল্পের জন্য বানরটাকে ধরতে পারল না। পাশের বড় গাছটায় উঠে কোনমতে প্রাণ বাঁচাল বানরটা। নাগালের বাইরে গিয়ে বানরটা প্রতিজ্ঞা করল — এই কুকুর লেলানোর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ছি না।

এদিকে মেয়েরা যে যার কাজে লেগে গেছে। কেউ বেগুন তুলছে— আবার কেউবা তূলো। আবার কেউবা খোঁপায় গুঁজে নিচ্ছে এক গাদা ফুল, কেউবা ধরছে গান।

কুকুরটা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুপুর গড়িয়ে এল। খাবার সময় হয়েছে। কাজ ছেড়ে সবাই ডাকা-ডাকি করে চলল 'রিতুকু'(গামছা) নিয়ে চান করতে। জলের ধারে গিয়ে সবাই গামছা পরে জলে নামল। 'রিগনাই', 'রিছা' (শাড়ী, বক্ষাবরণী) গুলো রেখে দিল এক জায়গায় জমা করে।

এদিকে বানরটা গাছের মগডালে পাতার আড়ালে থেকে সব দেখছিল। মেয়েরা যখন আপন মনে চান করছিল, কুকুরটাও গাছের ছায়ায় ঘুমুচ্ছে — সুযোগ বুঝে বানরটা চুপিসারে নেমে এল গাছ থেকে। কাপড়গুলো গুটিয়ে নিয়ে আবার গিয়ে গাছের উপরেই বসে রইল। মেয়েদের কারো নজরেই পড়ল না বানরটাকে।

মেয়েরা চান সেরে উপরে উঠে এসে দেখে, কাপড়গুলো নেই। কি হল, কোথায় গেল, বলাবলি করছিল আর এদিক ওদিক খুঁজছিল। ঠিক তক্ষুণি বানরটা গাছের ডাল ধরে ঝাকুনি দিতেই মেয়েরা উপর দিকে তাকাল। ওরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, বানরটাই ওদের কাপড়গুলো মগডালে তুলে রেখেছে। এখন উপায়! কি করে কাপড়গুলো ফিরে পাওয়া যায়! প্রকাণ্ড গাছ, তার উপর মেয়ে মানুষ। গাছে চড়ে কাপড়গুলো পেড়ে আনবে তারও উপায় নেই। সাত সিঁড়ি মই অবশ্য একটা গাছে লাগানো রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা যেতে পারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, এক্ষুণি বাড়ী ফিরতে হবে। কি করে কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি ফিরে পাওয়া যায় তাই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। মেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটি সবার চেয়ে বড় সে-ই প্রথম গিয়ে বানরের কাছে কাপড়গুলো চেয়ে নেবে বলে ঠিক হল। এর বদলে বানরটা বেগুন খেতে চায় তো ওকে দেওয়া হবে।

বড় মেয়েটি গাছের নীচে এগিয়ে হাত তুলে বলল— "য়ু-য়ু-দাদায়ুই, আন রিগনাই কাংছা (ও দাদা আমাকে একটি পাছড়া দাও)।"

গাছে থেকেই বানর বলল—"য়াখ্‌লি এংছা কাফায় গ্রাদি, ফানতক আলিছা রীফায় গ্রাদি — হোক ছিনালী হোক (মইয়েয় এক সিঁড়ি উঠে এস, এক গণ্ডা বেগুন এনে দাও, ভ্রষ্টা নারী)।"

বড় মেয়েটি ওর কথা মত এক গণ্ডা বেগুন হাতে নিয়ে সিঁড়ি এক ধাঁপ উঠে দাঁড়াল। বানরটি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বেগুনগুলো নিয়ে ওকে একটি শাড়ী দিয়ে দিল।

তা দেখে দ্বিতীয় মেয়েটিও এগিয়ে দিয়ে বানরকে বলল -"য়ু-য়ু-দাদায়ুই আন রিগনাই কাংছা।"

বানরটি বলল—"য়াখ্‌লি এংনীয় কাছাগ্রাদি ফানতক আলিকনুই রীফায় গ্রাদি (সিঁড়ি দু'ধাপ উঠে এস, দুগণ্ডা বেগুন এনে দাও)।'

মেয়েটি সিঁড়ির দু'ধাপ উঠে দু'গণ্ডা বেগুন বানরের হাতে তুলে দিল। বেগুনগুলো হাতে নিয়ে বানর ওকেও একটি শাড়ী ফিরিয়ে দিল।

এমনি করে ছ'ছটি মেয়েই পর পর এক একটি সিঁড়ি উপড়ে উঠে একেক গণ্ডা করে বেশী বেগুন দিয়ে ওদের নিজের নিজের শাড়ী নিয়ে এল। রইল শুধু ছোট মেয়েটি। এবার তারই পালা। সে-ও গিয়ে অন্যদের মত কাপড় চাইলে বানরটি বলছে—"য়াখ্‌লি এংছিনি কাছাগ্রাদি, ফানতক আলিকছিনি রীফায় গ্রাদি, হোক ছিনালী হোক। (সিঁড়ি সাত ধাপ উঠে এসে আগে সাত গণ্ডা বেগুন এনে দাও ভ্রষ্টা নারী)।"

কি আর করবে বেচারা, ভয়ে ভয়ে সাত গণ্ডা বেগুন হাতে নিয়ে সিঁড়ির সাত ধাপ উপরে উঠে এল মেয়েটি। এদিকে সঙ্গের মেয়েরা বাড়ীতে চলে যাচ্ছে। মেয়েটির সিঁড়ি বেয়ে নিজের কাপড় নেবে, না সঙ্গের মেয়েদের অপেক্ষা করতে বলবে কোনটা আগে করলে ঠিক হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। আগে কাপড়টা নিলেই ভাল হবে। কাপড়টা হাতে এলে দৌড়ে গিয়েও ওদের নাগাল পাওয়া যাবে বলে ভাবল ও।

অতিকষ্টে সাতধাপ সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটি সাত গণ্ডা বেগুন এগিয়ে দিল বানরের দিকে। বানর কিন্তু এবার হাত বাড়িয়ে বেগুন নিলে না, মেয়েটির হাত ধরেই টেনে তুলে নিলে গাছের উপরে। মেয়েটির চীৎকার শুনে অন্য মেয়েরাও ফিরে এল গাছের নীচে। কিন্তু এর মাঝেই বানরটি মেয়েটিকে টেনে হিঁছড়ে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়েছে।

এদিকে বেলাও পড়ে এসেছে। এভাবে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেটে কিছুই হবে না। তার চেয়ে বাড়ীতে গিয়ে বড়দের জানালে যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। ওরা বাড়ী ফিরে এল। রাতের অন্ধকারে বড়রাও জুমে গিয়ে মেয়েটির কোন হদিশ পেল না। এতক্ষণে বানর মেয়েটিকে কাঁধে বয়ে গভীর বনের কোন এক বিরাট গাছের উপর নিয়ে তুলেছে।

দিন যায়। না খেয়ে, কেঁদে দিন কয়েক কাটিয়ে দিল মেয়েটি। বানরের সঙ্গে কি মানুষ থাকতে পারে! কিন্তু পালিয়ে যাবার উপায়ও নেই। অগত্যা মেয়েটি বানরের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে বাধ্য হল। বানরের সঙ্গেই মেয়েটি ঘর করতে লাগল।

মেয়েটি বানরের সঙ্গে ঘর করছে বটে, মনে কিন্তু তার পালাবার বুদ্ধি রয়েই গেল। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল। বার কয়েক বানরের সংসার থেকে পালাতে চেষ্টাও করেছিল — পারে নি। বার বারেই ধরা পড়ে গেছে। সেই থেকে, কখন পালিয়ে যায়, এ ভয়ে, মানবী স্ত্রীকে দিন রাত আলগিয়ে থাকে বানর।

বছর ঘুরে এল। এদিকে বানরের ঘরে ছেলেও হয়েছে একটি। গাছের ডালেই বড় হতে লাগল বানরের ছেলে। এবার হয়ত বৌ আর পালাবে না ভেবে বানর অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

কিছুদিন যেতেই একদিন বানর বৌ বানরকে জানাল, সে আবার সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। তাই 'থাইচুকতীয়' (একপ্রকার টক্-ফল, আমড়া) খেতে ইচ্ছা করছে।

বানর যেখানে সংসার পেতেছিল কাছে পিতে কোথাও 'থাসতুই' গাছ নেই। 'থাসতুই' পেতে হলে অনেক দূরে যেতে হবে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী টক ফল খেতে চেয়েছে, এনে না দিলেই নয়। তাই বানরকে বাধ্য হয়ে যেতে হল দূরে — মানুষের গাঁয়ে টক ফল আনতে।

বানর বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি পালিয়ে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগল। এ্যাদ্দিন বানরের সঙ্গে ঘর করে কিছুটা হলেও মায়া হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে কি মানুষ বানরের সঙ্গে ঘর করতে পারে? তাকে পালাতেই হবে। তবু কেন যেন চোখে জল আসে। যাবার সময় চোখ মুছে উনুনে চাপানো ভাতের হাঁড়িকে বলতে লাগল "মায়তাক্ নাঙ আহাইন বলক বলক অংঅই তঙদি দ।" (ভাতের হাঁড়ি, তুমি এমনি টকবক করতে থেকো)।

ঘরের পোষা বেড়ালকে বলল— "নৌঙব মিয়ং মিয়ং পুংঅই তঙদি দ।" (তুমিও মিউ মিউ ডাকতে থেকো)।

'চাখাইখক'কে (ছাই থেকে ক্ষারজল চুইয়ে নেবার বাঁশের তৈরী মোচাকৃতি পাত্র) বলল,— "নুংব আহাইন তপ্ তপ্ কৌলাই তঙদি দ।" (তুমিও এভাবে টপ্ টপ্ জল ঝরাতে থেকো)।

এভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বানর বৌ ছেলে ততেকে কোলে তুলে নিলো। পিঠের উপর ঝুলিয়ে নিলে একটা 'লাঙ্গা' (জিনিষপত্তর বয়ে নেবার জন্য বাঁশ দ্বারা বানানো খাচি বিশেষ) হাতে নিলে একটা দা। এবার বনের পথে বাপের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

তখনও সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় নি। বানর 'থাইচুকতীয়' নিয়ে ঘরে ফিরে এল। এসে দেখে ঘরে বৌও নেই, ছেলে ততেও নেই। কোথায় গেল ওরা, মা আর ছেলে? ভাতের হাঁড়িতে টগবগ করে জল ফুটছে, বিড়ালটা মিউ মিউ করে ডাকছে, চাখাইখক্ থেকেও ফোটা ফোটা জল ঝরছে। দেখে মনে হচ্ছে, খানিকটা আগেও ঘরে ছিল। কাছেই কোথাও গিয়ে থাকবে ভেবে এদিক ওদিক খুঁজে দেখল খানিকটা। নাঃ নেই কোথাও। "অ— ততেমা, অ—ততেমা' বলে চীৎকার দিয়ে ডাকল। নাঃ সাড়া দিলে না কেউ। রাগে দুঃখে ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁদতে লাগল ততের বাপ। পোষা বিড়ালটা ডেকে ডেকে গা ঘেঁষে এসে বসেছিল। বিরক্ত হয়ে জোরে বিড়ালের মাথায় কষিয়ে দিলে এক ঘা। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটাও গেল মরে।

বৌ নেই, ছেলে নেই। কিছুতেই ঘরে মন বসছিল না বানরের। এক ফাঁকে বিড়ালটার চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়া দিয়েই বানাল একটা বাদ্যযন্ত্র। নাম তার "দং দরং"।

তা বাজাতে বাজাতেই সে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল বৌ আর ছেলের খোঁজে। পথ চলছে, আর দং দরং বাজাচ্ছে। বাজনার তালে তালে সুর করে গাইতেও লাগল—

"অ— দনি দং দরং দনি দং
আনি ততেমা বিয়াং থাংজালাং?
দনি দং দরং দনি দং।
বৌছা ততেন বামতিরই
লাংগা ছুকাইতাং হরতিরই
দাছা দাবুরা তাইতিরই
আনি ততেমা বিয়াং থাংজালাং?
দনি দং দরং দনি দং
দনি দং দরং দনি দং .....।

(দনি দং দরং দনি দং আমার ততেমা মা কোথায় চলে গেল; দনি দং দরং দনি দং। ছেলে ততেকে কোলে করে। গিলা বীচির ন্যায় মসৃণ খাড়া মাথায় নিয়ে হাতে একখানা দা নিয়ে— আমার ততের মা কোথায় চলে গেল? দনি দং দরং দনি দং .....)।

গেয়ে বাজিয়ে বন জঙ্গল পেরিয়ে মানুষের জুমের পাশ দিয়ে বৌ আর ছেলের খোঁজে যাচ্ছে বানর। অমনি একদিন এক জুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ও। জুমে কাজ করছিল চাষীরা। ওরা দেখল, একটা বানর কি যেন একটা বাজিয়ে ওদের জুমের পাশ দিয়েই গেয়ে যাচ্ছে। খুব মজা পেল, ওরা। বানরকে ওরা জিজ্ঞাসা করল "কিগো কি গাইছিলে তুমি?" বানরটি গানের সুরেই উত্তর দিল—

"দনি দং দরং দনি দং
আনি ততেমা বিয়াং থাংজালাং .....।"

চাষীরা বলল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেদিন ছেলে কোলে একটি মেয়েকে এ পথে দেখেছি বলেইতো মনে পড়ছে। সে তোমার স্ত্রী হবে বোধ হয়।" খুশি হয়ে বানরটি ওদের খুব আশীর্বাদ করল —"তোমাদের জুমের ফসল দ্বিগুণ হোক, সারা বছর খেয়েও উদ্বৃত্ত থাকুক।"

পথ চলতে চলতে একদিন বানর তার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। দূর থেকে বাবাকে দেখেই ছেলে বলে উঠল— "মা — মা, চেয়ে দেখ, ওই বাবা আসছে।"

মা ছেলেকে ধমকিয়ে উঠল— "দূর বোকা, তোর বাবা কোথায়? এ যে দেখছি একটা বানর।" ছেলে কিন্তু দৌড়ে গিয়ে বাবার কোলে উঠে বসল।

এদিকে মেয়ের মা-বাবা ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে — 'ফায়দি, ফায়দি, নগ হাব ফায়দি চামারিছা' (এস, এস, ঘরে এস জামাই) বলে ঘরে তুলে নিলে জামাইকে। পাড়ার লোকেরা দেখতে এল জামাইকে। জামাই এসেছে বলে পান ভোজন শুরু হল। অনেক রাত অব্দি চলল পান ভোজন। পড়শীরা যে যার মত বাড়ীতে ঘুমোতে গেল।

এদিকে নেশায় চুর হয়ে ঝিমুচ্ছিল বানর। তার স্ত্রী তাদের মাচার ঘরটিতে বিছানা পেতেছে। বিছানার পাশেই বেশ খানিকটা জায়গায় বাঁশ নেই। বড় একটা ফোকর। নেশায় বুঁদ, বানর তা দেখেনি। স্ত্রী এসে তাকে হাতে ধরে নিয়ে সেই ফাঁকটির পাশেই শুইয়ে দিল। ছেলেকে মাঝখানে রেখে নিজেও শুয়ে পড়ল।

মদের প্রচণ্ড নেশা, তার উপর অনেক রাতও হয়েছিল। বিছানায় পড়তে না পড়তেই বানর ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে মেয়েটির চোখে কিন্তু ঘুম নেই। কেমন করে বানরের হাত থেকে রেহাই পাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ কথাই শুধু ভাবছিল সে।

এদিকে ঘুমের ঘোরে বানর নাক ডাকাচ্ছিল। মেয়েটি ভাবল, এইতো সুযোগ। হাত বাড়িয়ে সে বানরকে নাড়া দিয়ে বলল— "থাইছিং ততেফা, থাইছিং; নছা ততেছা কিছিনাই থায়খা। থাইছিং ততেফা থাইছিং" (একটু সরো ততের বাপ, একটু সরো, একটু সরো। ছেলে ততে চাপা পড়ে মরেছে— একটু সরে ঘুমোও।)

'দ-দ-দ' (এই যে — এই যে) বলে বানর একটু সরে শুল। খানিক বাদেই আবার নাক ডাকতে শুরু করল। এবারও স্ত্রী তাকে নাড়া দিয়ে বলল "থাইছিং— নছা ততেছা কিছিনাই থায়খা। থাইছিং ততেফা থাইছিং।"

এবারও ততের বাপ 'দ-দ-দ' বলে খানিকটা সরে গেল। এভাবে বার কয়েক সরে যেতে যেতে এক সময় মাচার ফোকর গলে একদম নীচে পড়ে গেল ততের বাপ, বানর।

মাচার নীচে ছিল শুয়রের দল। ওখানটায় এক হাটু কাঁদা। কাঁদায় পড়ে বানরটা আর সহসা উঠতে পারল না। এরই ফাঁকে শূয়োরগুলো দাঁত দিয়ে বানরটাকে চিড়ে ফেলল। ততেমা বানরের হাত থেকে মুক্তি পেল। ❑

পুরোহিত

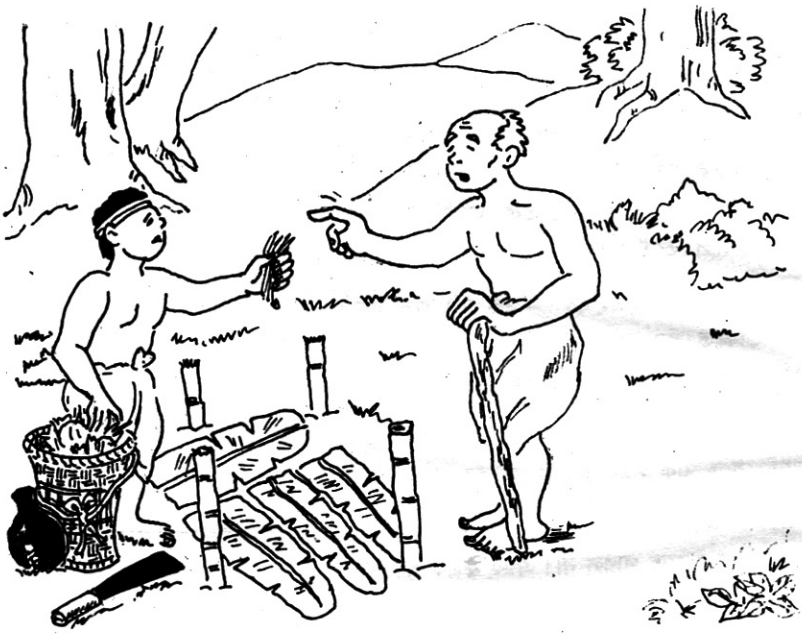

দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁ। এক বিধবা ও তার ছেলে সে গাঁয়ের এক ঘর। অনাথা বিধবা। ত্রিসংসারে সবেধন নীলমণি একমাত্র ছেলে। ছেলেটি কিন্তু ভারী আলসে। কাজ কর্ম কিছুতেই মন নেই! গাঁয়ের সমবয়সীরা সবাই বিয়ে থা করেছে। কিন্তু তা হলে কি হবে। কাজ করা দূর থাক— বিধবার ছেলেটি কিন্তু ঘর থেকে এক পা-ও নড়ে না। সে আবার করবে বিয়ে! বিধবার খেত খামার নেই। পড়শীর জুমে "য়াগুল" (দিন বদলী) দিয়ে যা পায় তা দিয়েই ঘর সংসার চালায়। কিন্তু এমন করে আর কদ্দিন চলবে, বয়েস তো বাড়ছে বই কমছে না। সংসারের অভাব অনটনও দিন দিন বেড়েই চলছে। তাই একদিন মা ছেলেকে বলছে— আচ্ছা বাবা, গাঁয়ের আর পাঁচটি ছেলেতো জুম কাটে, জুম পুড়ে। তুমিও যাওনা জুম কাটবে। আমি এভাবে আর কদিন খাইয়ে রাখব?" মায়ের কথায় ছেলের ভারী রাগ হল। সেও চলল জুম কাটতে। একটা 'চেম্পাই' (ছোট খাড়া, যাতে করে

ছোট ছোট দরকারী জিনিষ বয়ে নেওয়া হয়) মাথায় নিয়ে। জুমে গিয়েই কিন্তু বিধবার ছেলে বাড়ী ফিরে এল। ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে মা তো অবাক! মা তাকে জিজ্ঞাসা করছে—"অন্যরা সারাদিন কাজ করেও জুম কাটার কাজ শেষ করতে পারে না। তুমি এইমাত্র গেলে— কি করে জুম কেটে চট করে ফিরে এলে?" ছেলে বিজ্ঞের মত উত্তর দেয়— "তুমি কিছু ভেবো না মা। দেখই না, আমি কি করেছি।" বিধবার ছেলে জুমে গিয়ে একটা 'ঘিলা' লতা কেটে ফিরে এসেছে। ঘিলা লতাটা ছিল মস্ত বড়— সমস্ত জুমটা জাগটিয়ে। গোড়াতে কেটে দেওয়া মাত্রই লতাটা মরে গেল। মা চুপ করে রইলেন ছেলের কথা শুনে।

বেশ কিছুদিন যায়। জুমে আগুন দেওয়ার সময় এল। একদিন মা আবার ছেলেকে বলছে —"গাঁয়ের সবাইতো জুম পোড়াচ্ছে। তুমিও পোড়াবে বলেইকেটে এসেছ। জুমে আগুন দেবে না বাবা?" — "জুমে আগুন দেবার সময় হয়েছে কি মা? আচ্ছা, তাহলে দেবোখন।" ছেলে উত্তর দেয়। জুম পোড়া দেওয়ার দিন বিধবা মা তার ছেলেকে সাত জুমের মাটি, সাত পুকুরের জল, সাতটা মশাল বেধে দিলে। যাবার সময় বলে দিল—"জুম পোড়া দেবার সময় দেবদেবীদের বন্দনা করে পোড়া দিস্। দেখিস্ অন্যের ছেলেপিলেরা পোড়া যেতে পারে; তাদেরও বন্দনা করে আগুন দিস্।" বন্দনার মন্ত্রটা বলে দিল— "কারো ছেলে পিলে মারা গেলে অভিশাপ দিতে পারবে না। গাল মন্দকাটতে পারবে না। পূর্ব পুরুষের রীতি অনুসরণ করছি আমরা। তাই জুম পোড়া দিচ্ছি — পুড়তে বাধ্য হচ্ছি।"

জুমে গিয়ে বিধবার ছেলে কেটে রেখে আসা ঘিলা লতাটিতে আগুন ধরিয়ে দিতেই দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা বনে। এদিকে বাড়ীতে মা —যতক্ষণ জুম পোড়া শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ এক কলসী জল চালনি দিয়ে ঢেকে তার উপর একটা পাখা রেখে ছিল। সে বনেই ছিল নাগ রাজার ছেলেমেয়েরা। ওরা সবাই আগুনে পুড়ে ছাই হল। নাগরাজা সে সময় বাড়ীতে ছিল না। ছেলেপিলেদের খাবারের খোঁজে গিয়েছিল। এমনি সময়ে নাগরাজা বাড়ীতে ফিরে এল। আগুনের জন্য ঘরে ঢোকা দূরে থাক —কাছেই ঘেঁষতে পারল না। ওদিকে ছেলেপিলেরা সবাই মারা গেছে। রাগে দুঃখে নাগরাজা জুম পুড়িয়েকে সাজা দেওয়ার জন্য ওর বাড়ীতে গিয়ে ওদের ঘরটাকে সাত পাকে জড়িয়ে রেখে দারুণ আক্রোশে ফুঁসতে লাগল। ঘরের ভিতরে বিধবা মা বন্দী। ভয়ে গাঁয়ের লোকেরা ধারে কাছেও যেতে পারল না।

জুমে কাজ শেষ হলে বিধবার ছেলে বাড়ী ফিরে এল। ঘরে ঢুকতে চাইলে নাগরাজা গর্জন করে উঠে— বের হতে চাইলে ও। উঠানে দাঁড়িয়েই সে মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল— 'কি করতে পারি এখন মা? কেন এমন হল? ভেতর থেকে মা উত্তর দিল "বন্দনা করে জুমে আগুন দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তা করোনি। তাই এরকম হয়েছে। যা হবার তো হল। এখন এক কাজ কর। একটা কাল মোরগ, কিছু খই, এক বোতল মদ, কিছুটা হলুদ, একটা দা ও কলাপাতা নিয়ে যাও। বনে গিয়ে মামা, মামা বলে ডেকো। ডাকলেই সে সাড়া দেবে। কি করতে

হবে সেই তোমাকে বলে দেবে।" মা'র কথামত বিধবার ছেলে বনে গিয়ে 'মামা-মামা', বলে ডাকতে লাগল। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে এভাবে ডেকে চলল সারাদিন। বেলা শেষে এক 'লুঙ্গা' (ঢালু অথবা নীচু জমি) থেকে কে যেন উ-ই-ই-ই বলে সাড়া দিল। যেদিক থেকে সাড়া এল ওদিকে এগিয়ে বলল বিধবার ছেলে। লম্বা-চওড়া, মিশকালো মস্ত বড় এক বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কাছে গিয়ে বিধবার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল — "তুমিই কি আমার মামা? তুমিই কি সাড়া দিয়েছিলে?" —"হ্যাঁ আমিই সাড়া দিয়েছিলাম" সে লোকটি বলল। পরিচয় পেয়ে ছেলেটি বলল — "দেখ মামা, জুম পোড়া দেওয়ার সময় নাগরাজার ছেলেমেয়েরা সবাই পুড়ে মরেছে। মা'র কথামত বন্দনা করে পুড়িনি বলে নাগরাজা ছেলেমেয়ে হারিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের ঘরটি সাত পাকে ঘিরে রেখেছে। মা ঘরের ভেতর আটকে আছে। কি করতে হবে জিজ্ঞাসা করাতে জিনিষপত্তর নিয়ে মামার কাছে যাও, যা করবার সেই করবে, বলে মা আমাকে পাঠিয়েছে। তুমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করো শীগ্‌গীর। নয়ত মা মারা যাবে।" — "আচ্ছা, আচ্ছা, এক্ষুণি করে দিচ্ছি। আমি যেভাবে বলব সেভাবে করে যাও" বুড়ো লোকটি বলল। বুড়ো লোকটি তখন কলাপাতাগুলোকে বিছিয়ে বাঁশগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখতে বলল। সেও বুড়ো লোকটির পায়ের কাছে ওগুলো সাজিয়ে রাখল। বোতল থেকে কিছু মদও ঢেলে দিল মাটিতে পোঁতা বাঁশগুলোতে। কলাপাতার উপর দা টাকে শুইয়ে রাখল। এগুলো করা হলে তাকে 'অচাই' (পুরোহিত) হতে বলা হল। কিন্তু কি করে 'অচাই' হতে হয় সে তা জানে না। তাই সে মামাকে বলল —"কেমন করে অচাই হতে হয় মামা?" —"আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই না হয় তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমি 'যা যা বলব, তুমিই আমার সঙ্গে বলবে।" বুড়ো বলে চলল —

"যে খেতে বলবে, যে পান করতে বলবে,
যে দাঁত কড়মড় করবে, যে পেছনে নিন্দা করবে —
তাকে মেরে ফেল, তাকে উদ্ধার করো।

বিধবার ছেলেটিও সাথে সাথে বলে গেল।

"আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে, হয়েছে' - বলে বুড়ো লোকটি।

"নাও, এবার বন্দনা কর ঃ সে কলাপাতাটা কেটে কেটে বন্দনা করছে।" "যে খেতে বলবে, যে পান করতে বলবে, তার দেহ কাটি, তার হৃদয় কাটি।" এই বলে সে সাতবার কলাপাতাটা কাটল।

এদিকে কলাপাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে বিধবার ঘরে সাতপাক দেওয়া নাগরাজার শরীরটাও সাত টুকরো হয়ে গেল।

পূজা শেষে বুড়ো বলল —"নাও, এবার হয়েছে তো? এখন বাড়ী যাও।"

—"তা ঘর আগলানো নাগরাজার কি হবে মামা? তার শরীরটা কাটা না গেলে কি উপায় হবে? তোমাকেই বা আর কোথায় পাব? কাতর স্বরে বলল বিধবার ছেলে। — "তুমি এত

চিন্তা করো কেন? গিয়েই দেখনা একবার। আমার আর দেখা পাবে না। অবশ্যি তার দরকারও হবে না। আমার অবর্ত্তমানে যখন যেমন দরকার হবে মাকে জিজ্ঞাসা করবে। ওই বলে দেবে কি করে কি করতে হবে।" এতটুকুন বলে বুড়ো লোকটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সেই বুড়ো লোকটি হল দেবতা — "বুড়ো দেবতা" বিধবার অলস ছেলেটা আর কারো নয় - তারই।

বিধবার ছেলে দ্বিধাগ্রস্ত মনে বাড়ী ফিরে এল। এসে দেখে, সত্যি সত্যিই কলাপাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গেই নাগরাজার শরীরটাও সাত টুকরো হয়ে গেছে। ছেলে মার কাছে বুড়ো দেবতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলল। এতক্ষণে ওরা হাফ ছেড়ে বাঁচল। তখন ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করল — "আচ্ছা মা, আমি পূজো দিলাম বলেই না নাগরাজার শরীরটা কাটা গেল। আমরা বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। মানুষ অসুখ-বিসুখে পড়ে এভাবে পূজো দিলে ভাল হবে কি? "দিয়েই দেখ না" - মা বলে। সেদিন থেকে মানুষ অসুখ-বিসুখে পড়লে "বুড়ো দেবতার" পূজো দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। আর যারা এ পূজোর পুরোহিত হয় তাদেরকে বলে "ঢেঙা-অচাই" বা আলসে পুরোহিত। ❑

উইপোকা স্বামী

দশ পাড়ায় সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের পাড়ার এক জুমচাষী। চাষী আর চাষী বৌ — দু'জনের ছোট্ট সংসার। বিয়ের দু'এক বছর পর চাষী বৌ এর একটি মেয়ে হল। মেয়ে হওয়ার পরই বৌটি মরে গেল। সংসারে রেখে গেল কচি একটি মেয়ে আর স্বামীকে। বেচারা স্বামী। বৌ মারা যাওয়ার পর কচি মেয়েটিকে নিজের হাতেই যত্নআত্তি করতে লাগল। ঘর গেরস্থালীর কাজও করতে হয় চাষীকেই। একা আর পেরে উঠছিল না বেচারা। তাই দেখে শুনে একটি বিধবা মেয়েলোককে আবার বিয়ে করে আনল ঘরে। সে মেয়েলোকটিও সঙ্গে নিয়ে এল একটি মেয়ে সন্তান। এখন চাষীর ঘরে দু'টি মেয়ে। একটি তার নিজের, অন্যটি বৌ-এর। চাষীর মেয়েটি ছিল ছোট, আর তার বৌ-এর মেয়েটি ছিল বড়।

মেয়ে দু'টি বড় হয়েছে। বুকে 'রিছা' (বক্ষাবরণী) বেঁধেছে। এমনি সময়ে একদিন মেয়েদের মা চাষীকে বলল — 'কই গো শুনছ, বলছিলাম কি, মেয়েদের তো বিয়ের বয়েস

হল। ওদের সমবয়সী সবারই বিয়ে থা' হয়ে গেছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে হলে কোথাও কথা জুড়ে বিয়ে ঠিক করছ না কেন? বুড়ো বৌ-এর কথার জবাব দেয় — "আরে ধ্যাৎ, আমি কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা জুড়ব? ওদের ভাগ্য ভাল হলে এখানেই খোঁজ করতে আসবে খ'ন।" বুড়ীও গলার স্বর ভারী করে বলে — হ্যাঁ-হ্যাঁ আসবে বৈকি!" বুড়ো আর বুড়ী দু'জনের মধ্যে এ ধরণের কথাবার্ত্তা প্রায়ই চলত। এক ধরণের কথাই শুনতে হত বুড়োকে প্রায়ই। আর বুড়োও যেত খুব রেগে। এমনি আর একদিন চাষী বৌ তার স্বামীকে বলছে —"কইগো, মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। জামাই খোঁজ করছ না কেন? বুড়ো বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ আজই দেখব। জামাই দেখতে হলে আগে আমাকে এক "ওয়াছুং (বাঁশের এক গাঁট থেকে অন্য গাঁট পর্যন্ত অংশ) তরকারি, আর এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে দাও দিকিনি। জামাইর সঙ্গে দেখা হলে যাতে খাওয়াতে পারি।" তার পরদিন রাত ভোর না হতেই চাষী বৌ এক "ওয়াছুং" তরকারি, আর এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে বুড়োর হাতে তুলে দিলে। বুড়ো ওগুলোকে 'চেম্পাইতে (জিনিষ-পত্র বয়ে নিয়ে যাবার ছোট খাচি বিশেষ) চাপিয়ে বনে চলল জামাই খুঁজতে। লোক নেই, জন নেই গভীর বনে গিয়ে আপন মনেই বুড়ো গলা চিরে ডাকতে শুরু করে দিল — 'অ-জামাই, অ-জামাই, অ-জামাই সাড়া দাও' বলে। ডাকতে ডাকতে সারাটা দিন কেটে গেল। কোথায় কে? জন মানবশূণ্য গভীর বনে কে-ই বা উত্তর দেবে? কেউ সারা দিল না। সারাদিন ডেকে ডেকে বুড়ো ক্লান্ত হয়ে গেছে। বিরক্তিও এসে গেছে খুব। তাই ভাবছে, আর খানিকটা ডেকে দেখি, সাড়া না পেলে ভাত তরকারিগুলো আমিই খেয়ে নেব। তাই আবার ডাকল — 'অ-জামাই, অ-জামাই, অ-জামাই' বলে। একবার ডাকছে, খানিকটা থামছে, আবার ডাকছে। এমনি সময়ে দূর বন থেকে 'উ-ই-ই' বলে কেউ যেন সাড়া দিলে। আরে সারাদিন ডাকলাম, কেউ সাড়া দিলে না, এখন দেখছি সাড়া দিচ্ছে। সত্যি সত্যিই সাড়া দিচ্ছে কিনা পরখ করে দেখতে হবে বৈকি! তাই আবার ডেকে দেখল। এবারও দূর বনের আড়াল থেকে সাড়া পাওয়া গেল — উ-ই-ই। 'হ্যাঁ, সত্যিই তো!' বুড়ো বনের পথ পরিস্কার করে এগুতে লাগল সেদিকে। — যেদিক থেকে সাড়া এসেছিল। এভাবে খানিকটা গিয়েই পেল একটি উইয়ের ঢিবি। উইয়ের ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আবার ডাকল। এবার কিন্তু কেউ 'উ-ই-ই' বলে সাড়া দিলে না।' হায়, খানিকটা আগেই তো সাড়া দিয়েছিল, এখন আবার সাড়া দিচ্ছে না কেন? এর-ই মাঝে কি হল আবার! তাহলে, এ উইয়ের ঢিবিতেই জামাই লুকিয়ে আছে হয়, তা-না হলে সাড়া দিচ্ছে না কেন? বুড়ো উইয়ের ঢিবির পাশেই ভাত তরকারিগুলো ঢেলে দিল। জামাই বলে কথা, শ্বশুরের সামনে খেতে লজ্জা পেতে পারে বলে তাই খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরেই বুড়ো ভাবছে, জামাই হয়ত এতক্ষণে খেয়ে থাকবে। গিয়েই দেখা যাক্। বুড়ো এগিয়ে গেল দেখতে। সত্যিই তো! এক দংগল উই ঢিবির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে খাবারগুলো চষে ফেলেছে। "হা-লা জামাই, এবার ধরা পড়েছ। আর যাবে কোথায়?" বুড়ো সবগুলো উইপোকা চেম্পাই-এ তুলে নিয়ে এল বাড়ীতে। বাড়ীতে এসেই বুড়ীকে বলল — "কইগো,

এই এনেছি তোমার জামাই'' বলেই বিছানাতে ঢেলে দিলে উইগুলোকে। যেই ঢেলে দেওয়া হল অমনি ভেতর থেকে একদল উই কিলবিল করে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। সঙ্গে কিছু কিছু লাল পিঁপড়েও ছিল। ভয়ে বুড়ীর কাঠ হয়ে যাবার উপক্রম। মনের কথা বুঝতে না দিয়ে বুড়া বুড়ীকে বলল ''এ বুঝি তোমার জামাই? এতো দেখছি এক দংগল উইপোকা।'' বুড়ি মনে মনে ভাবছে, ''আচ্ছা, দেখাই যাক্। তোমাকেও আক্কেল দিতে হবে দেখছি।''

রাত্তিরে বুড়ী চাষীর মেয়েকে বলছে ''এই যে নাকুতি, তোর বাবা জামাই খুঁজে এনেছে। শুতে যাস্না কেন!'' মানুষ কি কখনও উই পোকার সঙ্গে ঘুমোতে পারে! মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না। অনেক কেঁদে কেটে বলল মাকে। মেয়ে যতই কেঁদে কেঁদে বলছে মা ততই রেগে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মা রেগে গিয়ে চীৎকার করে মেয়েকে বলছে — ''তোর বাবাইতো জামাই খুঁজে এনেছে, তোকে তার সঙ্গে শুতেই হবে।'' মেয়েকে শাসাচ্ছে আর বকছে। তিষ্টোতে না পেরে বুড়োর মেয়েকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হল বাসর করতে। কি আর করবে। লাক্ড়ি রাখার ঘর হল ওদের বাসর ঘর।

এক রাত্তির বাসর করে এল উইপোকার সাথেই। লাল পিঁপড়া আর উইপোকার কামড় খেয়ে হাত পা ফুলে কলাগাছ। পরদিন ঘুম থেকে উঠে গাঁয়ের সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে চাষীর মেয়েও জুমে গেল কাজ করতে। কাজের মরশুম। ছেলে মেয়ে মিলে একদল লোক কাজ করছে জুমে। ওদের সঙ্গে বুড়ীর মেয়েটিও আছে। ও-ই সবাইকে বলে শোনাল —''শোন, শোন ভারী মজার কথা। নাকুতি উইপোকার সঙ্গে বাসর করেছে। ও উইপোকার বৌ।'' ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। লজ্জায়, অপমানে চাষীর মেয়ে কাজ না করেই ফিরে এল ঘরে। এইভাবে একরাত দু'রাত তিনরাত বাসর করল উইপোকার সঙ্গেই। বেচারা কি আর করবে! এমনি সময়ে একদিন রাত্তিরে উইপোকার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দর যুবক। ও মেয়েটিকে বলল, ''শোন আমি এক রাজার ছেলে। এক যাদুকরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। হেরে গিয়ে শাপগ্রস্ত হয়ে উইপোকা হয়ে আছি। কোন নারী যদি আমাকে স্বামী বলে বরণ করে নেয় তবেই আমার শাপ কেটে যাবে। তুমি কোন চিন্তা করো না। আমার শাপ মোচন হবার সময় এসেছে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই রান্না করতে গেল বুড়ো চাষীর মেয়ে। জুমে যেতে হবে। তার মা ভাল করে চেয়ে দেখল মেয়ের দু'কানে দুলছে সোনার দুল। ব্যাপারখানা যেন কি রকম ঠেকছে! আগে তো কখনও ওর কানে দুল ছিল না। ওরা বলাবলি করতে লাগল — ''লাক্ড়ি ঘরে একা একা ঘুমায় কিনা, অন্যকোন ছেলে রাত্তিরে দিয়ে থাকবে হয়ত।'' জুমে গেল। সেখানেও সবার মুখে এ কথাই ফিরছে। এতসব শুনেও কিন্তু কিছুই বলল না মেয়েটি। সেদিন রাত্তিরেও ঘুমোতে গেলে কুমার বেরিয়ে এল। মেয়েটি বলল — ''আমরা এভাবে থাকলে ঘর সংসার হবে কি করে? ঘর সংসার করতে হবে

তো?" কুমার তখন বলছে — "শোন, আমি এভাবে এসেও থাকতে পারব না। কাল তুমি এক কাজ করবে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকব আগুন জ্বেলে উইগুলোকে তখন পুড়িয়ে ফেলবে। উইগুলি যখন আগুনে মরতে থাকবে তখন তুমি আমার হাত পা ভাল করে টিপে দিও। পাখাও রাখবে, দরকার মত বাতাস করবে। ঠাণ্ডা জল রাখবে, খেতে হবে। তাহলেই আমি আর উইপোকার ভেতরে ঢুকতে পারব না।

পরদিন রাত্তিরে কুমার যখন ঘুমিয়েছে চাষীর মেয়ে আগুন জ্বেলে উইগুলোকে পুড়ে ফেলল। এদিকে উইপোকারা আগুনে জ্বলে পুড়ে মরার সময় চাষীর মেয়েও স্বামীর হাত পা টিপে দিতে লাগল। এক সময়ে উইপোকারা আগুনে পুড়ে শেষ হল। কুমারও আর উইপোকার ভেতরে ঢুকতে পারল না। রাত ভোর হলে ঘরের ভেতরেই স্বামীর হাত পা ধুইয়ে দিল চাষীর মেয়ে। দুপুরবেলা খুব ভাল করে রেঁধে খাবার থালা সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে গেল ওদের শোবার ঘরে। সেখানেই আসন পেতে কুমারকে খেতে দিল। এদিকে এতসব দেখে শুনে ওর মা ভাবছে, নাকুতি আজ এত সুন্দর করে খাবার সাজিয়ে নিচ্ছে কার জন্য? এর ভেতর নিশ্চয় কোন রহস্য রয়েছে। দেখেই আসিনা কেন ভেতরে কি হচ্ছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েই অবাক! সত্যিই তো এ যে দেখছি সুন্দর একটি ছেলে। লম্বা চওড়া গড়ন, গায়ের রং ফরসা। মানুষ নয়তো যেন দেবতা, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে পাড়ার লোকদের জানিয়ে এল খবরটা। তোমরা সবাই এসে দেখে যাও আমার মেয়ের জামাই। ওর কথায় পাড়ার লোকেরাও দৌড়ে এল। হ্যাঁ, সত্যিইতো। একদল গেল, অন্যদল এল। সবশেষে এল পাড়ার বুড়ো-বুড়ীর দল। এদিকে কুমারেরও খাওয়া শেষ। বুড়ো-বুড়ীরা সাহস করে ঘরে ঢুকে বসল গিয়ে। বুড়োর দলের একজন প্রথম কথাটা পাড়ল। ও বলল — "আচ্ছা বাবা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না। তুমি লজ্জা পাও কিনা, রেগে যাও কিনা ভাবছি। তবু জিজ্ঞেস করতে হয়, তুমি আমাদের গাঁয়ের জামাই বলে। তোমার বাড়ী কোথায় আমাদের জানতে খুব ইচ্ছা।" সে উত্তর দিল —"দেখ, আমি কোন এক রাজার ছেলে। শাপগ্রস্ত হয়ে উইপোকা হয়েছিলাম। কোন নারী আমাকে পতিরূপে বরণ করলে আমার অভিশাপ কেটে যাবে বলে কথা ছিল। আপনাদের মেয়ে আমাকে পতিরূপে বরণ করাতে আমার অভিশাপ কেটে গেছে। কালই আমি আমার রাজ্যে ফিরে যাব।"

পরদিন রাজপুত্র গাঁয়ের বড়দের প্রণাম করে বৌকে নিয়ে তার রাজ্যে ফিরে গেল।

সেদিন থেকেই চাষী বৌ হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। বুড়োর মেয়ের যা হোক, রাজার ছেলের সঙ্গেই তো বিয়ে হল। কিন্তু ওর নিজের মেয়ের তো আজও হিল্লে হল না। তাই বুড়োকে রোজই বলতে লাগল —"কইগো, আর একজন জামাই খুঁজে আনবে কবে? আরও একটি মেয়ে রয়ে গেল যে।" বুড়োকে এভাবে জ্বালাতন করছে খেতে শুতে

সব সময়ই। বুড়োও একদিন রেগে গিয়ে বলল — "হ্যাঁ-হ্যাঁ কালই যাব। এক 'ওয়াছুং' তরকারি,এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে দিও।" পরদিন বুড়ো এক হাঁড়ি ভাত আর এক 'ওয়াছুং' তরকারি চেম্পাইতে চাপিয়ে বনের পথে চলল জামাই খুঁজে আনতে। বনে গিয়ে সে 'অ-জামাই' বলে ডাকতে লাগল। এভাবে চেঁচালো সারাদিন, বনের এপার থেকে ওপার ঘুরে ঘুরে। কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। এদিকে সূয্যিও ডুবু ডুবু। এমনি সময়ে বুড়ো পুরানো একটা জুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ও পথেই মস্ত বড় একটা অজগর সাপ খুব আরাম করে শুয়েছিল। অজগরটাকে দেখেই বুড়ো বলতে লাগল — "ব্যাটা পাঁজি কোথাকার, আমি সারাদিন ডেকে থেকে হন্যে হয়ে গেলাম, আর তুই কিনা এখানে শুয়ে শুয়ে খুব আরাম করছিস্। নে-নে খাবারগুলো খেয়ে বাড়ীতে চল দিকিনি এবার।" এই বলে বুড়ো খাবারগুলো সাপের মুখের সামনে ফেলে দিয়ে খানিকটা দূরে যেতে না যেতেই সাপটা সবগুলো খাবার খ্যোঁৎ করে খেয়ে ফেলল। বুড়ো ভাবছে, এটাই জামাই হতে পারবে। বুড়ো আর কি করবে। সাপটাকে বাঁশের বেত দিয়ে খুব করে গলাতে বেঁধে 'চেম্পাই'তে পুরে সোজা নিয়ে এল বাড়ীতে। জামাই দেখে সবাই মনে মনে খুব খুশী হল।

রাত্তিরে চাষী বৌ মেয়েকে বলেছে—"শুতে যাসনা কেন মানুং? লাক্ড়ির ঘরেই তাদের শুতে হবে। অজগর সাপের সঙ্গেই শুতে গেল চাষী বৌ -এর মেয়ে।

রাত্তিরে অজগর সাপটা বুড়ীর মেয়ের হাঁটু অব্দি গিলে ফেলল। থাকতে না পেরে সে ডেকে বলছে— মা, মা আমার হাঁটু অব্দি গিলে ফেলেছে।" ও ঘর থেকে মা বলছে— "চুপ করে থাক মা, তোকে গয়না পড়িয়ে দিচ্ছে।" খানিক পরে মেয়েটি আবার ডেকে বলছে— "মা, মা আমার কোমর পর্যন্ত গিলে ফেলল যে।" মা বলছে— "আরও খানিকটা চুপ করে থাক মা। তোকে গয়না পড়িয়ে দিচ্ছে।" আস্তে আস্তে সাপটা চাষী বৌ-এর মেয়ের বুক পর্যন্ত গিলে ফেলল। এবারও মেয়েটি কাতরাচ্ছে আর বলছে— "মা আমার বুক পর্যন্ত গিলে ফেলল যে। আমি যে আর পারছি না।" তখনও ওঘর থেকে মা বলছে— "আর খানিকটা সয়ে থাক মা। তোকে নিশ্চয়ই গয়না পরিয়ে দিচ্ছে।" এবার অজগরটা ঘ্যোঁৎ করে আস্ত মানুষটাই গিলে ফেলল। আর একটুও শব্দ বেরুল না।

খেয়ে দেয়ে সাপটার পেট ফুলে ঢোল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাক্ষুসে অজগরটা লম্বা হয়ে শুয়ে রইল ঘরের পেছনে কলা বাগানে। রাত ভোর হল। ঘর থেকে কেউ বেরুচ্ছে না দেখে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ কেউ "হায় ঘরের ভেতর কেউ নেই যে দেখছি! মেয়েও নেই, বরও নেই। এদিক ওদিক ঘুরে দেখল সবাই। ওমা, বর দেখছি কলা ঝাড়ের নীচে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আস্ত মানুষটা গিলে পেট ফুলে ঢোল এদিক ওদিক নড়তে পারছে না। তখন দা, কুড়ুল নিয়ে সবাই পেট কেটে ফেলতেই বেড়িয়ে এল হাঁড় মাংস গুড়িয়ে যাওয়া চাষী বৌ-এর আদরের মেয়েটি। কি আর করবে ওকে! তখন সবাই মিলে অজগরটাকে কেটে কুটে খেয়ে ফেলল। ❑

রাজহাঁসের কাহিনী

ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চাপিয়ে বিধবা ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। মনে খুব লেগেছে— "কী ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি! আজ রাঁধা মাছগুলো পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে হল! কপালে আরও কি আছে কে জানে!" সে শুধু একথাই ভাবছে।

খানিক বাদেই ছেলে ঘরে ফিরে এল। 'খেরাং' এ (দাগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য বাঁশের খাপ বিশেষ) দা গুজে রেখে 'ছাইছর' (কাপড় রাখার আলনা বিশেষ) থেকে গামছা নিতে নিতে বলল— "আজ লাকড়ি বেচতেই পারিনি মা। কেউ কিনছে না বলে শেষ পর্যন্ত একেবারে জলের দরেই বেচে এলাম। যা বেচেছি তা দিয়ে শুধু চাল কিনে এনেছি— আর কিছুই আনতে পারি নি। খুব খিদে পেয়েছে মা। তুমি ভাত বেড়ে রাখগে। আমি এক্ষুণি হাত পা ধুয়ে আসছি।"

ছেলে গামছা নিয়ে হাত পা ধুতে গেলে মা উনুনে চাপানো হাঁড়িতে চাল ধুয়ে

দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাত হয়ে গেল। ছেলে এসে খেতে বসলে শুধু ভাতই এনে ছেলের সামনে বেড়ে দিল। তরকারি রাঁধেনি এক বিন্দুও। শাক সব্জীও ঘরে বাড়ন্ত। "ছেলে ঘরে এলে দাম দেব" বলে জেলেদের কাছ থেকে মাছ রেখে খানিকটা ঝোল রেঁধেছিল তা ছেলেও সময় মত ঘরে ফিরেনি জেলেদের মাছের দামও দিতে পারে নি বলে ওরা মাছ দিয়ে রাঁধা তরকারিটুকু অবধি নিয়ে গেছে। খানিকটা ঝোল এখনও হাঁড়ির তলায় পড়ে আছে। তা-ই বাটিতে করে এনে ছেলেকে খেতে দিল। ঝোল খেয়ে ছেলে খুব স্বাদ পেল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করল— "এ কিসের ঝোল মা? এমন স্বাদের তরকারী তো কখনও খাই নি।"

মায়ের মুখে রা নেই। শেষ পর্যন্ত ছেলের কথায় বলতেই হল। চোখের জল ফেলে মা বলতে লাগল — "আজ দুপুরে হাতে কাজ ছিল না, দাওয়ায় বসে আছি। এ পথ দিয়েই এক জেলে যাচ্ছিল মাছ নিয়ে। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই বললাম — "তা কিছুটা রাখতে পারি, কিন্তু ছেলে ঘরে না এলে দাম পাবে না। তাতেই রাজী হল সে। কিছু মাছ দিয়ে গেল। মাছগুলো কেটে কুটে রেঁধে তোমার পথ চেয়ে আছি। এদিকে জেলেও ফিরে এসে মাছের দাম চাইল। তার যাবার তাড়া। কি আর করব! তুমিও আসনি, আমার হাতেও কানাকড়ি নেই। তা রাঁধা তরকারিগুলোই জেলেকে ফিরিয়ে দিতে হল।

এসব শুনে ছেলে বলল — "ঘরেতো এক আঁটি লাক্‌ড়ি রয়েছে। তা' কাল বনে যাচ্ছি না। ওগুলো বেচেই চাল নিয়ে আসব। আর দুপুরবেলা রাজার পুকুরে গিয়ে বড়শী ফেলব — দু'একটা পেয়ে যাই তো খেতে পারব।"

মা বলল — "রাজার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে বকুনি খেয়ে মর আর কি।" ছেলে বলল — "কত লোকই তো বড়শী ফেলে মাছ ধরছে মা। কাউকে কিছু বলে না — কেউ মানাও করছে না। আমাকেই কেন বলতে যাবে? যদি কেউ বারণ করে — ফিরে আসলেই হবে। তুমি কিছু ভেবো না।

পরদিন খুব ভোরে লাক্‌ড়ির আঁটিটা বেচে চাল কিনে আনল ছেলেটি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে পুকুরের এক কোণে গিয়ে বড়শী ফেলে বসে রইল। সারাদিন বসে রইল চোখ টাটিয়ে — একবারও খেল না কিছুতে। খালি হাতেই ফিরতে হবে তাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড়শী উঠাতে যাবে - এমন সময় কোত্থেকে একটা রাজহাঁস এসে ওর বড়শীটাকে খেয়ে ফেলল। খাওয়া মাত্রই বড়শীটা টেনে তুলল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল একবার, কেউ নেই। যারা বড়শী ফেলেছিল, সবাই যে যার মত চলে গেছে। সুযোগ পেয়ে সেও রাজহাঁসটি গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে বাড়ী নিয়ে এল। সে রাজহাঁসটা ছিল — রাজার পোষা হাঁস।

রাজহাঁস দেখেই মা আঁৎকে উঠল। খুব ভয় পেয়ে সে ছেলেকে বলল — "বাবা, এতো দেখচি রাজহাঁস। তুমি চুরি করে এনেছ। যেখান থেকে এসেছ ওখানেই এটাকে রেখে

দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাত হয়ে গেল। ছেলে এসে খেতে বসলে শুধু ভাতই এনে ছেলের সামনে বেড়ে দিল। তরকারি রাঁধেনি এক বিন্দুও। শাক সব্জীও ঘরে বাড়ন্ত। "ছেলে ঘরে এলে দাম দেব" বলে জেলেদের কাছ থেকে মাছ রেখে খানিকটা ঝোল রেঁধেছিল তা ছেলেও সময় মত ঘরে ফিরেনি জেলেদের মাছের দামও দিতে পারে নি বলে ওরা মাছ দিয়ে রাঁধা তরকারিটুকু অবধি নিয়ে গেছে। খানিকটা ঝোল এখনও হাঁড়ির তলায় পড়ে আছে। তা-ই বাটিতে করে এনে ছেলেকে খেতে দিল। ঝোল খেয়ে ছেলে খুব স্বাদ পেল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করল— "এ কিসের ঝোল মা? এমন স্বাদের তরকারী তো কখনও খাই নি।"

মায়ের মুখে রা নেই। শেষ পর্যন্ত ছেলের কথায় বলতেই হল। চোখের জল ফেলে মা বলতে লাগল — "আজ দুপুরে হাতে কাজ ছিল না, দাওয়ায় বসে আছি। এ পথ দিয়েই এক জেলে যাচ্ছিল মাছ নিয়ে। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই বললাম — "তা কিছুটা রাখতে পারি, কিন্তু ছেলে ঘরে না এলে দাম পাবে না। তাতেই রাজী হল সে। কিছু মাছ দিয়ে গেল। মাছগুলো কেটে কুটে রেঁধে তোমার পথ চেয়ে আছি। এদিকে জেলেও ফিরে এসে মাছের দাম চাইল। তার যাবার তাড়া। কি আর করব! তুমিও আসনি, আমার হাতেও কানাকড়ি নেই। তা রাঁধা তরকারিগুলোই জেলেকে ফিরিয়ে দিতে হল।

এসব শুনে ছেলে বলল — "ঘরেতো এক আঁটি লাক্‌ড়ি রয়েছে। তা' কাল বনে যাচ্ছি না। ওগুলো বেচেই চাল নিয়ে আসব। আর দুপুরবেলা রাজার পুকুরে গিয়ে বড়শী ফেলব — দু'একটা পেয়ে যাই তো খেতে পারব।"

মা বলল — "রাজার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে বকুনি খেয়ে মর আর কি।" ছেলে বলল — "কত লোকই তো বড়শী ফেলে মাছ ধরছে মা। কাউকে কিছু বলে না — কেউ মানাও করছে না। আমাকেই কেন বলতে যাবে? যদি কেউ বারণ করে — ফিরে আসলেই হবে। তুমি কিছু ভেবো না।

পরদিন খুব ভোরে লাক্‌ড়ির আঁটিটা বেচে চাল কিনে আনল ছেলেটি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে পুকুরের এক কোণে গিয়ে বড়শী ফেলে বসে রইল। সারাদিন বসে রইল চোখ টাটিয়ে — একবারও খেল না কিছুতে। খালি হাতেই ফিরতে হবে তাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড়শী উঠাতে যাবে - এমন সময় কোত্থেকে একটা রাজহাঁস এসে ওর বড়শীটাকে খেয়ে ফেলল। খাওয়া মাত্রই বড়শীটা টেনে তুলল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল একবার, কেউ নেই। যারা বড়শী ফেলেছিল, সবাই যে যার মত চলে গেছে। সুযোগ পেয়ে সেও রাজহাঁসটি গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে বাড়ী নিয়ে এল। সে রাজহাঁসটা ছিল — রাজার পোষা হাঁস।

রাজহাঁস দেখেই মা আঁৎকে উঠল। খুব ভয় পেয়ে সে ছেলেকে বলল — "বাবা, এতো দেখচি রাজহাঁস। তুমি চুরি করে এনেছ। যেখান থেকে এসেছ ওখানেই এটাকে রেখে

আস গে।" মায়ের কথা শুনে ছেলে বলল — "তা তুমি ভেবো না মা। নিয়ে আসার সময় কেউ দেখেনি। আমি ছেঁচে ছুলে নিয়ে আনছি, তুমি চট করে রেঁধে ফেল দিকি নি। হাঁসের মাংস কখনও খাইনি। আজ যখন পেয়েই গেলাম — তখন চেখে দেখব বৈকি।"

ছেলে রাজহাঁসটা কেটে কুটে নিয়ে এলে মা খুব ভয়ে ভয়ে রাঁধল। রাত্তিরে মা ছেলে হাঁসের মাংস দিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে পাহারাদার হাঁস না পেয়ে এদিক সেদিক খুঁজতে লাগল। সেদিন যারা বড়শী ফেলেছিল — একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসা করল। সবার মুখেই এক কথা। সবার শেষে ওই বিধবার ছেলে বড়শী তুলেছে — বাড়ী গেছে। একাজ নিশ্চয় তার। সেই হাঁসটি চুরি করে নিয়ে গেছে। পাহারাদারেরা একবার ওর ঘরে খুঁজবে বলে ঠিক করল।

গভীর রাত। মা ছেলে দু'জনেই ঘুমিয়েছে। বাইরে কারা যেন কথা বলছে। শুনে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ছেলেকেও জাগাল। একদল লোক দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলাবলি করছে। সে দলেরই একজন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল — "ঘরে কে আছ? ওঠ, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও। আমরা রাজার লোক। রাজার পোষা হাঁস চুরি গেছে। তোমাদের ঘরের পেছনে হাঁসের পালক পেয়েছি। ঘরের ভেতরও খানিকটা দেখতে হবে।

ওদের কথা শুনে মা ছেলের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দরজায় দাঁড়িয়ে রাজার লোকটি গর্জে উঠল — "দরজা খুলে দেবে তো দাও, নয়ত দরজা ভেঙ্গেই ঘরে ঢুকব।"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলে। রাজার লোকেরা ঘরে ঢুকে 'বাকা' (উনুনের ওপরে ভাত, তরকারির হাঁড়ি এবং রান্নার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুছিয়ে রাখবার মাচা বিশেষ) থেকে এক হাঁড়ি মাংস নামিয়ে আনল। একজন হাঁড়ি থেকে এক টুকরো মাংস খেয়ে দেখল — হাঁসের মাংসই তো বটে। দলের সর্দারও এক টুকরো মাংস মুখে পুরে সত্যি কি মিথ্যা যাচাই করে দেখল। দেও বলল — 'হাঁ, সত্যিই তো। এতো হাঁসের মাংসই দেখছি।

কোমড়ে বেঁধে ওরা বিধবার ছেলেকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এল। ছেলেকে নিয়ে গেছে — দুঃখে বিধবা মাটিতে পড়ে খুব কাঁদল একচোট। রাজার লোক এসেছে, ভয়ে পড়শীদের কেউ একবারও দেখতে এল না।

সারারাত কেঁদে কেঁদে বিধবা হাপিয়ে উঠেছিল। রাত ভোর হতে আর দেরী নেই। ক্লান্ত, অবসন্ন বিধবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এসময় একজন বুড়ো মেয়েলোক স্বপ্নে এসে সান্ত্বনার সুরে বিধবাকে বলছে — "ওঠ, আর কেঁদো না মা। ছা' কলক দেবীকে ডাকো তাঁর মানত কর। তাঁকে পূজো দিলে তোমার ভাল হবে।

ঘুমের ঘোরেই বিধবা উত্তর দিল — "মাগো আমি খুবই দুঃখী। কাজকর্ম কিছুই করবার শক্তি নেই। আমার একমাত্র ছেলে। ও-ই খেটে-খুটে দু'মুঠো এনে আমাকে খাওয়ায়। সেও আজ রাজার হাঁস চুরি করে জেলখানায় পড়ে আছে। পূজোয় জিনিষ পত্তর কি করে জোগাব! কি করে তোমার পূজো হবে?"

অচেনা মেয়েলোকটি বলল — "তা তোমার চিন্তা করতে হবে না। তোমার ছেলে ফিরে আসবে। চটপট একটা কাজ কর দিকিনি। রাত ভোর হতে এখনও বাকী আছে। কেউ ঘুম থেকে না উঠতেই রাজহাঁসের একটা পালক ছা'কলক দেবীর নামে রাজার পুকুরে ফেলে আসগে। দেখো, ফিরে আসার সময় পেছন ফিরে তাকিও না কিন্তু।"

এতক্ষণে বিধবার মন কিছুটা শান্ত হয়েছে। সে বলল — "কি করে পূজো দিতে হবে কিছুইতো বললে না মা। কিছুইতো বুঝতে পারছি না।"

দেবী বললেন—"চাল, কলা, গুড় যোগাড় করবে। চল গুড়ো করে তিন রকম পিঠা ভাজবে। পূজোতে খানিকটা দুধও দিও। পূজার উপকরণগুলো কলাপাতায় সাজিয়ে দেবে। এসব হলে যারা দেবতার নামে উপোস করে থাকবে সবাই এক জায়গায় বসে ব্রতকথা শুনবে। যারা ব্রত করবে ওদের থেকেই একজন ব্রতকথা বলে শুনাবে। পূজোর সময় ধূপ-দীপ জ্বেলে দেবে, উলুধ্বনি দেবে। পূজো শেষে প্রণাম করে মনের বাসনা অনুসারে বর প্রার্থনা করবে। এরপর পূজোর জায়গাতে বসেই প্রসাদ নেবে।"

বিধবা জিজ্ঞাসা করল — "ব্রতকথা কি রকম হবে মা?" দেবী বললেন — "তা আর কি রকম হবে? তোমাদের এই রাজহাঁস চুরি যাওয়ার কাহিনীই হবে ব্রতকথা।

এতটুকু বলে দেবী চলে যাচ্ছিলেন। বিধবা আবার জিজ্ঞাসা করল — "তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, মা। দয়া করে পরিচয় দাও।" বিধবার কথা শুনে দেবী মুচকি হাসলেন। "সময় হলে সব কিছুই জানতে পারবে" বলে দেবী আচমকা মিলিয়ে গেলেন।

বিধবার চিন্তার অন্ত নেই। একি স্বপ্নই না আর কিছু হল! কিছুই বুঝতে পারছে না। 'সত্যি কি মিথ্যা পরখ করে দেখি' এই ভেবে বিধবা উঠে দাঁড়াল। এদিকে রাতও ভোর হয়ে আসছে। বিধবা আর দেরী না করে একটি পালক হাতে লাঠি ভর দিয়ে রাজবাড়ীর পুকুরের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে রাজহাঁসের পালকটি কপালে ঠেকিয়ে —"ছা'কলক দেবীর ব্রত প্রচার হতে হলে, এ পালকটাই একটা রাজহাঁস হয়ে যাক" বলে জলে ছুঁড়ে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে বিধবা বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগল। বিধবা পেছন ফিরতেই একটা রাজহাঁস যেন পাখা ঝাপটিয়ে জলে সাঁতার কাটছে শুনতে পেল। পেছন ফিরে তাকানোর ইচ্ছা হলেও তাকাল না।

এদিকে রাজাও শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলেন। একজন বুড়ো মেয়েলোক এসে বলছে — "হাঁস চুরি করেছে বলে বিধবার ছেলেকে জেলখানায় পুরে রেখেছিস্? ওদিকে হাঁস

দেখছি পুকুরেই সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।"

ভোর হতেই রাজা পুকুরে একজন লোক পাঠালেন। সত্যি সত্যিই পুকুরে একটা রাজহাঁস সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

পাহারাদারকে ডেকে পাঠালেন রাজা। ওকে খুব একটা ধমক দিয়ে বললেন — "তোরা দেখছি সব অপদার্থের দল। দেখে শুনে কাজ করতে পারিস না। হাঁসতো পুকুরেই রয়েছে। ওদিকে হাঁস চুরির দায়ে বিধবার ছেলেকে এনে জেলে পুরে রেখেছিস্। এ কেমন ধারা তোদের? আবার এরকম হলে সাজা পাবি বলে রাখছি। যা — শীগ্‌গীর বিধবার ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলগে। আর ওর হাতে পাঁচটা টাকাও দিয়ে দিতে বলছি।" পাহারাদার কিছুই বুঝতে পারল না। সে দৌড়ে গিয়ে জেলখানার লোকদের রাজার আদেশ বলে শোনাল। জেলখানার পাহারাদারও তাড়াতাড়ি বিধবার ছেলেকে ছেড়ে দিল। বিধবার ছেলে জেল থেকে ছাড়াও পেল, হাতে পাঁচটা টাকাও পেল। কিছুই না বুঝতে পেরে সে অবাক হয়ে রইল। কি আর করা যায়। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল।

ছেলে ফিরে এসেছে, হাতে পাঁচটা টাকাও পেয়েছে দেখে বিধবার খুব আনন্দ হল। ছেলেকে সে বলল — "বাবা, ছা' কলক দেবীর দয়াতেই এতটুকুন হল। তুমি এক্ষুণি বাজারে গিয়ে পূজোর জিনিষ পত্তর নিয়ে এস।"

মা'র কথা মত ছেলেও বাজারে গিয়ে পূজোর জিনিষ পত্তর সব কিনে আনল। পরদিনই পূজো। গাঁয়ের তিন চারজন মেয়েলোকও এসে জুটল পূজো দিতে। বিধবা যে রকম স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিল ঠিক তেমনি করে পূজোর আয়োজন করে ছা'কলক দেবীর ব্রতকথা বলে সবাইকে শোনাল। ব্রতকথা শেষ হলে সবাই মিলে পূজোর প্রসাদ পেল।

সেদিন থেকে ছা'কলক দেবীর আশীর্বাদে দিন দিন বিধবার ঘর সংসারের উন্নতি হতে লাগল। ❑

গুল্ম কুমারী

দশ পাড়ার সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের পাড়া। সে পাড়ায় থাকে এক গেরস্ত। ওরা সাতভাই। সবাই বিয়ে থা করেছে। একদিন সাতভাই জুমে গেল কাজ করতে। সাত ভাইয়ের বৌয়েরাও গিয়েছে ওদের সঙ্গে! জুমে কাজ করতে করতে সবার ছোট ভাই একটা গুল্ম কুড়িয়ে পেল। গুল্মটা ভারী গোল। গন্ধটাও ভারী চমৎকার। গুল্মটা পেয়ে সঙ্গের সবাইকে ডেকে দেখাল। "দেখ, দেখ আমি কী সুন্দর একটা গুল্ম পেয়েছি। এত সুন্দর, সুগন্ধি গুল্ম আমি আর কখনো দেখিনি। এটাকে বাড়ী নিয়ে যাব।" আর একবার সে গুল্মটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ভাল করে কোমরে গুঁজে রাখল। সুগন্ধি গুল্মটাকে ও ভাল বেসেই ফেলেছে।

জুমের কাজ শেষ। এবার ঘরে ফেরার পালা। ঘরে আসার সময়ও গুল্মটাকে সঙ্গে আনতে ভুলল না। ঘরে ফিরে গুল্মটাকে 'মাজাং' এর (ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষ

রাখার জন্য 'মাচা' বিশেষ) উপর খুব যত্ন করে রেখে দিল। আর সবাইকে বলে দিল, 'সাবধান' কেউ কিন্তু ওটাকে ধরবে না, খাবে না। তার স্ত্রীও বাদ গেল না। ওকেও নিষেধ করে দিল বার বার।

ওরা স্ত্রীর কথা এখানে কিছু বলে নিচ্ছি। স্ত্রী তার মানুষের আকৃতি হলে কি হবে, চাল চলন ছিল খুবই বিচ্ছিরি। একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে জানত না। ভোর হলে ঘর দোর ঝাট দেওয়া দূরে থাক, হাতে মুখে জল না দিয়েই যা পেত মুখে গুঁজে দিত। কথা বললে কাসর ঘন্টা বেজে উঠত। মাথায় চিরুণী পড়ত না কোনদিনই — মাথাখানা যেন একটি কাকের বাসা। দেখলে জ্যান্ত রাক্ষসী বলেই মনে হয়। নাম তার ছিলাই কুমারী।

সেদিন নিশুতি রাত। স্বামী স্ত্রী ঘুমিয়েছে। চারদিক নীরব কেউ কোথাও জেগে নেই। মাজাং এর উপর গুল্মটা তেমনি রয়েছে। এমনি সময় গুল্ম থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দরী মেয়েলোক। দোলন চাঁপার মত তার গায়ের সুগন্ধ; ঘর ভরে গেল মিষ্টি গন্ধে। গুল্ম থেকে বেরিয়ে গুল্ম কুমারী এক নিমিষে ঘরের সব কাজ করে ফেলল। ঘরদোর নিকিয়ে থালা-বাসন ধুয়ে মুছে পাঁচ তরকারি ভাত রেঁধে ফেলল। সবশেষে কয়েকটা পানের খিলি বানিয়ে সাজিয়ে রাখল। নিজেও এক খিলি মুখে দিয়ে রাত ভোর না হতেই আবার সেই গুল্মের ভেতরই গিয়ে লুকিয়ে রইল। ঘুম থেকে জেগেই ছিলাই কুমারী তো অবাক। বাঃ — আমাদের ঘরটা দেখছি একদম ঝকঝক করছে। ঘর দোরের কাজও দেখছি সবশেষ। কে এসে করে দিলে কে জানে; যাক ভালই হল। সে স্বামীকে ডাকতে লাগল — "লকই, অ— লকই, বেলা হল। উঠ, কাজে যাবে।" বৌ এর ডাকে এক সময় লকই উঠে বসল। চোখ খুলে তাকাতেই লকই-এর চোখ ছানাবরা! কী আশ্চর্য! আগে কখনো তো ওকে ঘরদোর ঝাট দিতে দেখিনি, নিকানো তো দূরের কথা। মুখ না ধুয়েই মুখে গুঁজতে লেগে যেত। আজ দেখছি ঘরদোর ঝকঝক করছে, হাঁড়ি-কুড়ি সব মেজে ঘসে পরিষ্কার! আমি না উঠতেই পাঁচ তরকারি ভাত রেঁধে ফেলেছে। পানের খিলিও দেখছি সাজিয়ে রেখেছে। আজ কি মতি হল কে জানে। তার ধরণ দেখছি একদম পাল্টে গেছে। এভাবেই চলতে লাগল ওদের সংসার। লকই জুমে যাওয়ার সময় প্রত্যেক দিনই 'গুল্মটা ধরবে না খাবে না' বলে শাসিয়ে যায়। জুম থেকে ফিরে এসে আবার গুল্মটা ঠিক আছে কি না দেখে। গুল্ম থেকেই ঘরময় দিনরাত সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে। লকইও ওটাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। হাতে কাজ না থাকলেই গুল্মটার কাছে এসে বসে থাকে। এদিকে ছিলাই কুমারী স্বামীর চালচলন দেখে রেগে আগুন। সে মনে মনে ভাবে, লোকটা দেখছি আমার চাইতে গুল্মটাকেই বেশী ভালবেসে ফেলেছে। ওকে মজা দেখাচ্ছি। ও সুযোগ খুঁজতে লাগল। একদিন লকই জুমে গেলে ছিলাই কুমারী গুল্মটাকে কেটে কুটে দূরে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এল। বেলা শেষে লকই জুম থেকে ফিরে এসে দেখল গুল্মটা নেই। রেগে গিয়ে সে বৌকে বলছে — "আমার গুল্মটা কোথায়? তুই-ই নিয়েছিস। বের করে দে বলছি, নইলে এক্ষুণি তোকে মেরে ফেলব।" ছিলাই কুমারীও গলা চড়িয়ে উত্তর দিল — "আমি তোমার গুল্মটা পাহারা দিয়ে বসে থাকি আর

কি! আমার কি কোন কাজকর্ম নেই? আপদগুলোকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়েছি! তুমি কি আমাকে তোমার মতই পাগল ভেবেছ? ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করে দেখ, ওরা নিয়ে থাকবে হয়ত।" পেল না তো পেলই না। কি আর করা যাবে। সেদিন থেকে ঘরের কাজকর্মও হয় না। রাত ভোর না হতেই রান্না-বান্নাও হয় না। ঘরের সুগন্ধতো চলেই গেছে। গুল্ম হারিয়ে সারাদিন লকই মুখ ভার করে থাকে। ঘুম, খাওয়া-দাওয়া একদম নেই বললে চলে। এমনি করে দিন যাচ্ছে ওর।

এদিকে—যেখানে গুল্মটা ফেলেছিল সেই আস্তাকুঁড়ে গজিয়ে উঠল মস্তবড় এক লেবু গাছ। দু'তিন মাসের মধ্যেই গাছটা তরতর করে বেড়ে উঠল। দেখতে দেখতে লেবুও ফলল একটা। কি অবাক কাণ্ড, এতবড় গাছটায় কিনা একটাই লেবু ফলল! চানে যাওয়ার পথে একদিন লকইর নজরে পড়ল লেবুটা। হয় হামেশা আমাদের গাছে যেমনটা ফলে থাকে লেবুটা কিন্তু তেমন ছিল না। ওটা ছিল যেমনি বড় তেমনি হলদে। এতবড়, এত সুন্দর লেবু কোনদিনই লকই-এর চোখে পড়েনি। লেবুটা তার ভারী পছন্দ হল। তাই ওটা তুলে নিয়ে আবার সেই মাজাং এর উপরেই যত্ন করে রেখে দিল। আর বৌকে বলে দিল, "দেখিস্ রাক্ষসী, আগে একবার গুল্মটাকে নষ্ট করেছিস্। তখন কিছুই বলিনি। এবার লেবু এনে রাখলাম। খবরদার, দেখিস্ ওটা ধরবি না, খাবি না কিন্তু। তাহলে কিন্তু রেহাই পাবি না বলে দিচ্ছি।"

সেদিন থেকে ঘর আবার সুগন্ধে ভরে রইল। রান্না-বান্না, নিকানো মোছানো সব কাজগুলোও হতে লাগল আগের মতই। গভীর রাতে চুপি চুপি বেরিয়ে আসত ছিলাই কুমারী। রান্না সেরে নিজে কিছুটা খেয়ে বাকীটা রাখত ওদের জন্য। পানের খিলি বানিয়ে কয়েকটা লকই-এর জন্য সাজিয়ে রেখে নিজের মুখেও পুরে দিত দু'একটা। সবাই তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। যাওয়ার আগে খানিকটা পানের পিচকি লকইর কাপড়ের কোণায় মুছে যেত। কিন্তু এতসব কাণ্ডকারখানা কেউ কিছু বলতে পারত না।

ছিলাই কুমারীও আগের মত খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে স্বামীকে ডাকতে লাগল — "কইগো লকই, ওঠ না - জুমে যেতে হবে যে।" লকইও ঘুম থেকে উঠে খেয়েদেয়ে জুমে যায়। কিন্তু যাওয়ার সময় বৌকে ধমকিয়ে যেতে ভুলে না। "সাবধান, আমার লেবুটা কিন্তু ধরবি না, খাবি না।" এভাবেই চলছে ওদের দিন। এসব ব্যাপার লকইকে কিন্তু ভাবিয়ে তুলল। গুল্মটা যখন ছিল তখনও ঘরের কাজকর্ম সব হত, এখন লেবু এনে রাখলাম — তাও দেখছি, আগের মতই সব হচ্ছে। এর মাঝে কি রহস্য লুকিয়ে আছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু তবুও কাউকে কিছু বলল না ও। নিজের মনে মনেই সবকথা চেপে রাখল। গুল্মটাকে যে রকম ভালবেসেছিল, এবার লেবুটাকেও সেভাবে ভালবাসতে লাগল ছিলাই কুমারীর স্বামী লকই। লেবু ঘরে আসার পর থেকেই লকইর চাল চলনও পাল্টে গেছে। যেচে কথা বলা দূরে থাকুক, পাঁচটা জিজ্ঞাসা করলে একটার উত্তর হয়ত দিলে, হয়ত দিলেই না। মুখের হাসিও মিলিয়ে গেছে। বৌকে যখন তখন ধমকাচ্ছে —

বকছে। এসবই ছিলাই কুমারীর কাছে অসহ্য ঠেকছে। খেয়েদেয়ে ছিলাই কুমারীর মনে সুখ নেই। এমনি সময়ে একদিন লকই জুমে গেলে ছিলাই কুমারী লেবুটা কেটে কুটে খেয়ে ফেলল। বীচি আর খোসা দূরে কোথাও ফেলে দিল। কাজ থেকে এসেই লকই মাজাং এর গোড়াতে গিয়ে দেখল, লেবুটা নেই। রেগে গিয়ে চীৎকার দিয়ে বৌকে জিজ্ঞাসা করছে — "আমার লেবুটা কোথায়? তুই-ই খেয়ে ফেলেছিস হয়ত। শীগ্‌গীর বল, লেবুটা কোথায় গেল?" ছিলাই কুমারীও উত্তর দেয় — "শোন, আজ ভাত খেতে বসে একদম রুচি হচ্ছিল না। লেবু দিয়ে হয়ত কিছুটা খেতে পারব, তাই খেয়েছি। খেয়েছি — তাতে কি হয়েছে? আর কি ফলবে না? তখন না হয় আর একটা এনে রেখে দিয়ো খন।" আর কি করা যায়। সেদিনকার মত সেখানেই শেষ হল।

দু'একদিন পরেই লেবুর খোসা ফেলা জায়গা থেকে গজিয়ে উঠল মস্ত এক লাউগাছ। লতা নয়ত যেন এক একটা কচি বাঁশ। উঠোনের পাশেই লকই মাচা বেঁধে দিয়েছে। গিলা লতা যেমনি সারা বন লতিয়ে থাকে — ঠিক তেমনি দেখতে দেখতে লাউ গাছটাও ছড়িয়ে পড়ল উঠোন জুড়ে। ফুলও ফুটল প্রচুর। কিন্তু হলে কি হবে, ফল ফলল কিন্তু একটাই, তার বেশী নয়। কী অবাক কাণ্ড, এতবড় গাছ, তাতে কিনা একটা মাত্র লাউ ফলল। তাহোক, লাউটা যেমনি বড় তেমনি সুন্দর। একদিন ছিলাই কুমারী উঠোন ঝাট দিচ্ছে আপন মনে। এমন সময়ে লাউ থেকে একটি মেয়েলোক বেরিয়ে এসে ছিলাই কুমারীকে এক ঘা লাথি কষিয়ে দিয়ে আবার লাউয়ের ভেতরেই গিয়ে লুকিয়ে রইল। সেদিন থেকে ছিলাই কুমারী উঠোন ঝাট দিতে গেলেই রোজ লাথি খেয়ে আসে। কিন্তু দেখতে পায় না কাউকে। এদিকে লকই লাউটা তুলতেও বারণ করে দিয়েছে। কি করা যায় এখন! একদিন ছিলাই কুমারী স্বামীকে বলছে —"দেখ নাগর, লাউটা ঝুলে থাকে বলে ভাল করে উঠোন ঝাট দিতে পারি না। আমি বলছিলাম কি ওটাকে কেটে খেয়ে ফেললে কেমন হয়! কি হবে ওটাকে রেখে?" লকই বলে — "খবরদার, আগে দু'তিনবার কিছু না বলেই তোকে ছেড়ে দিয়েছি। এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই তোকে মেরে ফেলব মনে রাখিস।" কিছুটা শক্ত হলে লাউটা ঘরে এনে তুলে রাখল লকই। ভোর না হতেই বৌ জুমে যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে ডেকে দেয়। ঘরটাও সুগন্ধে ভরে থাকে। লকইয়ের কাপড়ের কোণাতেও পানের পিচকির দাগ পড়তে লাগল। সত্যি সত্যিই কি জানি সুরু হল কে জানে! যখন গুল্ম আনলাম, তখন একবার, লেবু যখন আনলাম তখন একবার, লাউ আনলাম তাও দেখছি ঠিক আগের মতই চলছে। সেদিন থেকে লকইও বদলে গেল। স্বামীর চালচলন দেখে ছিলাই কুমারীও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। নাঃ— লাউটাকে শেষ না করা অব্দি কিছুই হবে না দেখছি। এ যাত্রাও লকই জুমে যাবার সময় বৌকে ধমকে যায় আগের মতই। একদিন লকই জুমে গেলে ছিলাই কুমারী লাউটা কুচি কুচি করে কেটে রেঁধে ফেলল — আপদ চুকে যাক্। ঘরে ফিরেই লকই দেখল লাউটা নেই। আগে তো ছেলেপেলেদের দোষ দিয়েছে, এবার কি বলে দেখি। লকই রেগে গিয়ে বৌকে জিজ্ঞাসা করে — "আমার লাউটা কোথায়?" ছিলাই

কুমারী বলল — "তা আমি কি করব? ঘরে তরকারি বাড়ন্ত, হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে রেঁধেছি তো কি হয়েছে?" লকই কিছুই বলল না। চান করে খেতে এলে লাউয়ের তরকারি দিয়েই ভাত বেড়ে দিল বৌ। বীচি শক্ত হয়েছিল, তাই লকইও ছিলাই কুমারী দু'জনের কেউই একটু তরকারিও খেতে পারল না। সবটা তরকারি জলেই ফেলে দিল। যাক, এবারকার মত আপদ তো চুকল। তরকারি না খেতে পারলেও ছিলাই কুমারী কিন্তু মনে মনে ভারী খুশী হল। খুব ন্যাকামো করছিলে, এবার তার সাজা পেলে। আর কখনও এমুখো হতে পারবি না।

এবার হল ন্যাটা মাছ। ঘাটের পাশে যেখানে রাঁধা তরকারিগুলো ফেলেছিল যেখানে জন্মাল একটা ন্যাটা মাছ — বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল। মাছটা ঘাটের পাশেই সারাদিন ঘোরাফেরা করে। যেইমাত্র ছিলাই কুমারী কলসী নিয়ে জল ভরতে যায় অমনি জল ঘুলিয়ে দেয়। পরিষ্কার জল আর ভরা হয় না। বাধ্য হয়ে নোংরা জল ভরেই ঘরে ফিরে ছিলাই কুমারী। মানুষ কি এত নোংরা জল খেতে পারে। জল খেতে দিলেই লকই রেগে যায়। স্বামী স্ত্রীতে এনিয়ে খুব ঝগড়া হয়। "একটু ভাল জলও যদি না খেতে পারি তো এরকম বৌ নিয়ে ঘর করা কেন?" একদিন ছিলাই কুমারী স্বামীকে বলছে— "দেখ, আমি তো ঘাটের পাশের সেই অলক্ষুণে ন্যাংটা মাছটার জন্য জল ভরতে পারছি না। মাছটাকে ধরে নিয়ে আসগে, একবেলা বেশ চলে যাবে। আর কখনও জল ঘোলা করতে পারবে না, সব সময় পরিষ্কার জল আনতে পারব। ভাল জল খেতে না পেরে এমনিতেই লকই রেগে আগুন। যেই মাত্র বলা অমনি গিয়ে ধরে নিয়ে এল ন্যাটা মাছটাকে। ছিলাই কুমারী মাছটা কেটে কুঁটে ভাল করে ঝোল রাঁধল। কিন্তু রাঁধলে কি হবে খাওয়ার সময় কিন্তু খেতে পারল না কেউ। গলায় মাছের কাঁটা লেগে প্রাণ যাবার মত অবস্থা। কাজেই সবটা তরকারি ফেলেই দিতে হল।

তরকারি যেখানে ফেলল সেখান থেকে গজিয়ে উঠল একটা বিরাট নারকেল গাছ। কিন্তু নারকেল ধরল মাত্র একটা — প্রকাণ্ড। নারকেলটা দেখেই লকইর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তাই তো, লেবু ধরল একটা, লাউও ধরল একটা। এখন নারকেল ধরল, তাও দেখছি একটাই। কী হচ্ছে, কে জানে। জীবনে সে কোনদিন এতবড় নারকেল দেখেনি। পাক ধরা মাত্র লকই নারকেলটা ঘরে নিয়ে এল। নারকেল এনেছে দেখেই ছিলাই কুমারী খেঁকিয়ে উঠল —"বলি পাগলের মত এগুলো কী করতে শুরু করলে! না পাকতেই বার বার গাছের জিনিষগুলোকে ঘরে এনে তুলছ! খেয়ে দেয়ে কি আর কাজ নেই?" সেও উত্তর দেয় —"তা আমার মত আমি থাকব, তোর বলার দরকার কি শুনি? নারকেলটা তুলে এনে রাখলাম, খেয়ে দেখিস, এবার সত্যি সত্যিই তোকে মেরে ফেলব। কে তোকে বাঁচায় দেখে নেব।" নারকেলটা ঘরে আনা অব্দি আবার শুরু হল ঘরের কাজকর্ম। ছিলাই কুমারীও ভোর না হতেই স্বামীকে ডেকে দেয় জুমে যেতে। খেয়ে দেয়ে লকই জুমে যায়। ঘরটাও সুগন্ধে ভরে থাকে। এদিকে লকইর চিন্তা ভাবনা দিন দিন বেড়েই চলছে। পিশাচ না দেবতা

এসে ঘরের কাজগুলো করে দেয় — পানের পিচকিই বা কে মেখে দিয়ে যায় — আর ঘরটাই বা কোন ফুলের গন্ধে ভরে থাকে, কিছুই বুঝতে পারে না লকই।

একদিন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওরা লকইকে জিজ্ঞাসা করল — "হ্যাঁরে লকই, তুই দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল কেন? বৌ তোকে খেতে দেয় না বুঝি? ঘরে যা যা হচ্ছিল বন্ধু বান্ধবদের সে সবই খুলে বলল। ওরা লকইকে একটা বুদ্ধি বাতলে দিলে। ওরা বলল, তুইতো সারা রাত জেগে থাকতে পারবি না। এক কাজ করগে, বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের ডগাটা কেটে রাত জেগে থাকবি। পাশে খানিকটা নুন রেখে দিবি। এর পরও ঘুম এলে—খানিকটা নুন আঙ্গুলের ডগায় লাগিয়ে দিবি। তাহলেই দেখবি, চোখে আর ঘুম আসবে না। আর তুইও তখন সব দেখতে পারবি।"

সেদিন রাত্তিরে—বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের ডগাটা সামান্য কেটে জেগে রইল লকই। আর চোখে ঘুম এলেই কড়ে আঙ্গুলের নুন ঘষে দিতে লাগল। রাত গভীর হল। কেউ আর জেগে নেই। এমনি সময় নারকেল থেকে বেরিয়ে এল এক পরমা সুন্দরী যুবতী। সে বেরিয়েই থুথু ফেলছে আর বলছে — "ছিঃ ছিঃ। ছিলাই কুমারীর ঘরের কী ছিরি! এতো দেখছি গোয়াল ঘর। এমন ঘরে মানুষ কি করে থাকে!"

চটপট ঘরটা ঝাট দিয়ে ফেলল কুমারী। তারপর পাঁচ তরকারি ভাত রেঁধে নিজেও কিছু খেল, ওদের জন্যও সাজিয়ে রাখল। থালা বাসনগুলো মেজে ঘষে সাজিয়ে রাখল একদিকে। এবার যাবার পালা। কয়েকটা পানের খিলি বানিয়ে বাটায় সাজিয়ে রাখল, কুমারী নিজেও একখিলি পান মুখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল — এমনি সময় লকই হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেই কুমারীকে জাপটে ধরল! আর কি যেতে পারে। লকই বলে উঠে —"দেখব বলে এ্যাদ্দিন অপেক্ষা করে আছি। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে কুমারী, আর লকইকে বলছে —"আমাকে ছেড়ে দাও বলছি, আমি এখানে কিছুতেই থাকতে পারবো না"। ওকে ধরে রেখেই লকই বলছে —"আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না, জেনে রেখো। থাকতে পারবে কি পারবে না তা আমি দেখব। লকই জোর করে কুমারীকে নিয়ে লুকিয়ে রাখল দূরে — অন্য কোথাও। এদিকে রাত থাকতেই লকই বনে গিয়ে খুব বড় একটা গর্ত খুঁড়ল। তারপর বাড়ীতে এসে 'জুমে অনেক কাজ পড়ে আছে' — বলে ছিলাই কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে গেল। ছিলাই কুমারী এতসব কিছুই বুঝতে পারেনি। কথা বলতে এক সময় লকই ছিলাই কুমারীকে সেই গর্ত্তের পাশে নিয়ে গিয়েই আচমকা এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে সেই বিরাট গর্ত্তের ভেতরে। গর্ত্তের নীচে আগেই কাঁটা দেওয়া ছিল। এবার উপরে আরও কিছু কাঁটা দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখল ছিলাই কুমারীকে চিরদিনের মত।

বাড়ীতে ফিরে লকই গুল্ম কুমারীকে বিয়ে করে নতুন করে ঘর সংসার শুরু করল। ❑

কথা বলো না

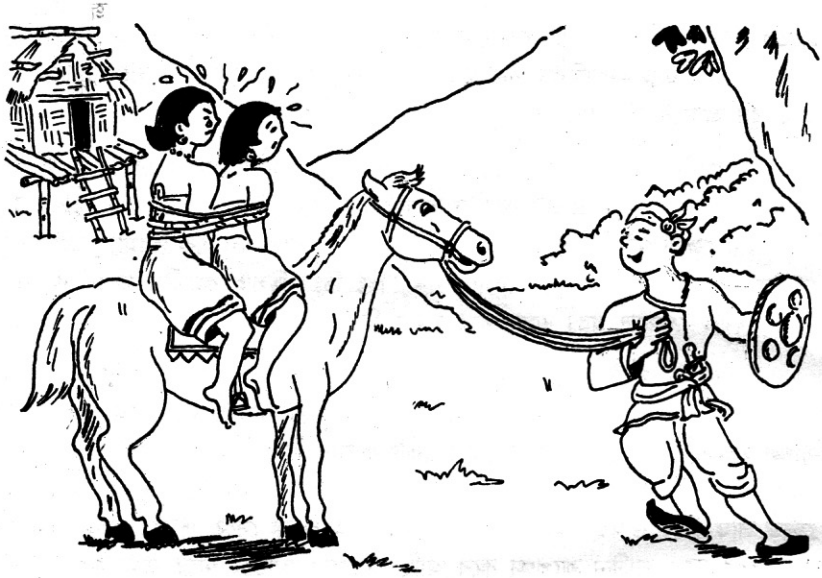

প্রাচীনকালে রাজার অন্দরমহলে দাসীর জন্য রাজার লোকেরা গাঁয়ে গাঁয়ে সুন্দরী মেয়েছেলে খুঁজে বেড়াত। রাজ্যের সেরা সুন্দরী মেয়েদের বেছে এনে রাজার অন্দরমহলে দাসী করে রাখত। তা ওর ছেলেই থাক, স্বামীই থাক, রেহাই পেত না — পছন্দ হলে জোর করে নিয়ে আসত। অবিবাহিত যুবতী হলে তো কথাই ছিল না। এমনি জোর করে আনা দু'বোনের গল্প বলছি।

আগের দিনে রাজ রাজাদের রাজত্বকালে গাঁয়ের যুবতীরা এবং সুন্দরী মায়েরাও ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। কখন জানি রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে যায়। এমনি যখন দেশের হাল — তখন পাহাড়ের এক গাঁয়ে এক জুম চাষী থাকত। তার দু'টি মেয়ে — ভারী সুন্দরী। কাজকর্মেও ওরা ভারী চালাক। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে রূপেগুণে ওদের সমান একজনও নেই। ওদের দেখলে 'মাইলুমা' (ধানের দেবী), 'খুলমা' (তুলোর দেবী) যেন নেমে

এসেছে বলে মনে হয়। দেবতাও ওদের রূপে ভুলে যায়। দেখতে দেখতে ওদের দেহে যৌবন নেমে এল — বর্ষার নদীর মত। যত শীগ্‌গীর সম্ভব বিয়ে দিতে হবে। বাপ-মা'র চিন্তার শেষ নেই। ঘর রাখাও এক সমস্যা। কখন জানি রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে যায়। জুম চাষীর জুমও তত ভাল না। তাই ঘরে রেখে বিয়ে দিতেও ভরসা পাচ্ছে না। বিয়ের পর খেতে পরতে হবে তো! স্নেহের বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারে না বলে পরের ঘরে মেয়ে পাঠাতেও মন চায় না। মেয়ে দু'টিও ওদের বাবা মাকে খুব ভালবাসে। ভালবাসে ওদের ছোট 'গারিংটি' কে (টং ঘরটিকে)। বেশ সুখেই যাচ্ছিল ওদের দিনগুলো।

কাজের মরশুম। এমনি সময়ে একদিন জুমিয়া আর ওর বৌ কাজে যাবে। মেয়েদের জুমে নিয়ে গেলে রাজার লোকেরা হয়ত দেখে ফেলবে। তাই ওদের সঙ্গে নিতে পারছে না। অন্য কারো নজরে পড়লেও খবরটা রাজার কানে পৌঁছতে দেরী হবে না। এসব কথা বাতাসের আগে যায় কিনা! তখন আর উপায় থাকবে না। সেখানেই জুম চাষীর ভয়। শেষ পর্যন্ত জুমচাষী অনেক ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করল। জুমে যাওয়ার আগে মেয়েদের বলে গেল — 'শোন মেয়েরা, রাজার লোক এলে তোমরা ঘর থেকে বের হবে না কিন্তু। চু-প করে ঘরের কোণে বসে থাকবে, রা করবে না।' মেয়েরাও টং-ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে রইল। মেয়েদের লুকিয়ে রেখে চাষী নিশ্চিন্তে জুমে গেল। চাষী বাড়ী থেকে বেড়িয়ে জুমের পথে খানিকটা এগিয়েছে — এমনি সময়ে রাজার লোকেরাও গাঁয়ে এসে হাজির। টং ঘরের এক কোণে দু'বোন বসে আছে — ভয়ে জড়সড়। গাঁয়ে রাজার লোক এসেছে, টের পেয়ে বড় বোন ছোট বোনকে বলছে — "ওই শোন, আপদগুলো এসে গেছে দেখছি। কথা বলিস না, চুপ করে থাক। টের পেলে এক্ষুণি ধরে নিয়ে যাবে।" দিদি কথা বলছে দেখে ছোট বোন দিদিকে কথা বলতে নিষেধ করছে। এভাবে এ ওকে বলতে বলতে কখন যে ওদের গলার সুর চড়ে গেছে বলতেই পারে না। টং ঘরের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল রাজার লোকেরা। দু'বোনের কথা শুনে ওরা থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ, দুটি মেয়ের গলার স্বরই তো ভেসে আসছে যেন! মেয়ে দু'টি একে অন্যকে কি যেন বলতে বারণ করছে। খুব মজার ব্যাপার দেখছি। টং ঘরে উঠেই দেখা যাক্ না একবার, কি হচ্ছে ওখানে। রাজার লোকেরা টং ঘরের উপর উঠে এল। বাঃ— কি সুন্দর দু'টি মেয়ে। রাজার লোকেরা অবাক হয়ে ভাবছে, আমরা এ্যাদ্দিন মিছেমিছি এদিক ওদিক ঘুরে মরেছি। এবার যাবে কোথায়! রাজার লোকেরা দু'বোনকে ধরে অন্দরে নিয়ে গেল। দু'বোনকেই দাসী করে রাখল রাজার অন্দর মহলে।

কাজ থেকে ফিরে এল চাষী আর চাষীর বৌ। ঘরে ঢুকে দেখল ঘর অন্ধকার। দু'টি মেয়েকেই ধরে নিয়ে গেছে রাজার লোকেরা। মেয়েদের শোকে দু'দিন বাদেই মরে গেল চাষী আর চাষীর বৌ। কত সাধ ছিল ওদের মনে। সুন্দর দু'টি ছেলে ঘরে এনে মেয়েদের বিয়ে দেবে বলে, — কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

ওদিকে মেয়ে দু'টির মনেও সুখ নেই। রাজবাড়ীর জাঁকজমকও ওদের মন ভোলাতে পারল না। সব সময় মন পড়ে থাকত বাপ মা'র কাছে — আর ছোট্ট টং ঘরটিতে। চোখের জলে দিন যায় ওদের। বনের পাখি যেন খাঁচায় বাঁধা পড়েছে। দিনরাত কেঁদে কেঁদে একদিন মরেই গেল ওরা।

আর এক জীবনের কথা। এ জীবন দু'বোন মানুষ হল না — পাখি হয়ে জন্মাল। পাখি হলে কি হবে, আগের জীবনের সব কথাই ওদের মনে ছিল। সে জীবনে কথা বলেছিল বলে রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল; ওরা কষ্ট পেয়েছিল। তাই এ জীবনে ওরা কথা বলে না, কথা বলো না বলে কাউকে ওদের অতীত জীবনের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ❑

বিচার

বিধবার জুমে ঢুকে শূয়োর ধান খায়। জুমে ঢুকে ধান খায় তার উপযুক্ত বিচার হওয়া দরকার। কেন শূয়োর মিছিমিছি বিধবার জুমে ঢুকে ধান খাবে!

একটা ব্যাঙ আর একটা চামচিকে। দু'জনেই খুব ভাব। একদিন ব্যাঙ চামচিকেকে তার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে এল। চামচিকেও এল নেমন্তন্ন খেতে। একথা সেকথা বলতে বলতে কি একটা কথা নিয়ে দু'জনের মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। এ্যাদ্দিন কিন্তু ওরা হরিহর আত্মা হয়েই চলে আসছিল। সেখান থেকেই দু'জনের মন কষাকষি শুরু। তাই ব্যাঙ বলতে শুরু করল —

বাঁশে ঢুকলে চিড়ে খাব,
গর্তে ঢুকলে খুঁড়ে খাব—
উড়ে যাবি তো বাঁশ আছে, পেরে খাব;
যাবি কোথায়? তোকে খাবই খাব।

ব্যাঙের কথায় চামচিকে ভারী ভড়কে গেল। কোথাও গিয়ে চামচিকে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কোথায় থাকবে, কি করে রাত কাটাবে এ চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুলল।

সাত পথের বাঁকে প্রকাণ্ড এক বট গাছ। সাতদিকে সাতটা ডাল ছড়িয়ে আছে। সে বট গাছে ধনেশ পাখী ডিমে তা দিচ্ছে। সে ধনেশ পাখির নাকের ফোকরে ঢুকে রাতটা কাটিয়ে দেবে ভাবল। নাকের ফোকরে কিছু ঢুকলে কি স্থির থাকা যায়। হলুদ ধনেশটারও নাক সুড়সুড় করতে লাগল। কি অসুবিধাই না হচ্ছিল ওর! ওদিকে গাছের মগডালে হাতে একটা ফল নিয়ে একটা বানর আপন মনে লোফালুফি করছিল। আর মনের আনন্দে গান গাইছে —

আমি খাব কি ছেলে খাবে,
দেখতে কিন্তু মন্দ নয়।
ফলটা ভারী গোল।
ছেলে খাবে কি আমি খাব,
দেখতে কিন্তু মন্দ নয়।
ফলটা ভারী গোল।

গান গাইছে তো গাইছে — খেয়াল ছিল না কোন দিকে। এমনি সময়ে আচমকা হলুদ ধনেশ পাখিটা বাসা থেকে হ্যাঁ-চ্-ছ্-চু করে উঠল। বনের হকচকিয়ে উঠল সাথে সাথে। হাত ফসকে ফলটা একদম গাছের নীচে হরিণের পিঠে গিয়ে পড়ল। হরিণটা ওখানে বিশ্রাম করছিল। ওর ছিল দিন দশ মাস। আজ নয়ত কাল বাচ্চা দেবে — এমনি অবস্থা। ফলটা যেই পিঠে পড়ল, অমনি পড়ি কি মরি — দে দৌড়। হরিণের যাওয়ার পথেই বন মোরগের বাসা। মুরগী বাসায় বসে ডিমে তা দিচ্ছিল। চলার সময় হুঁস ছিল না হরিণের — ডিমগুলো পা দিয়ে গুড়িয়ে দিয়ে গেল। মুরগী কোন মতে প্রাণ নিয়ে বাঁচল। ডিমগুলো নষ্ট হল, রাগে দুঃখে মুরগীর গা জ্বালা করতে লাগল। সেও রেগে গিয়ে লাল পিঁপড়েদের ডিমগুলো খেয়ে বাসা-খোসা তছনচ করে দিল। লাল পিঁপড়েরা রাগে গরগর। কি করবে কি না করবে! তেড়েমেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে একটা শূয়োরকে পেয়ে গেল। আরাম করে ঘুমুচ্ছে — হাত পা ছড়িয়ে। লাল পিঁপড়েরাও হাতের কাছে শূয়োরকে পেয়ে খুব করে কামড়ে দিলে একচোট। হাজার পিঁপড়ার কামড় খেয়ে কি আর মাথা ঠিক রাখা যায়! রাগে টগবগ করতে থাকে শূয়োর। দৌড়ে যাবার পথে পেয়ে গেল বিধবার জুম। আর যায় কোথায়! খেয়ে, মাড়িয়ে-দুমড়িয়ে যাচ্ছে তাই করে ছিল সবটা জুম।

বিধবা রাজার কাছে গিয়ে নালিশ ঠুকে দিলে —"ধর্মাবতার মহারাজ, মারলে পিঠে দাগ বসে যাবে, কেটে দেখলে গলায় রক্ত দেখতে পাবেন। এতটুকু কষ্টে গড়া বিধবার জুম, কোথাকার এক পাগলা শূয়োর নষ্ট করে দিলে। কত যুগ গেল, কোথাও কারো জুমে

ঢুকে শূয়োর ধান খেয়েছে শুনিনি। আপনি, যা হোক একটা বিচার করুন।"

রাজা সিপাইদের ডেকে পাঠালেন —"এই যে সিপাইগুলো কোথায় গেল?" সিপাইগণ — "আজ্ঞে, ধর্মাবতার।"

রাজা — "যাও, বিধবার জুম কতটুকু খেয়েছে দেখে এস। আর সে ক্ষেতের শূয়োরটাকে ধরে নিয়ে এস।"

রাজার হুকুম পেয়ে সিপাইরা সবাই চলল শূয়োরটাকে ধরে আনতে। সিপাইরা গিয়ে বিধবার শূয়োর খাওয়া জুমটা দেখল। তারপর পাগলা শূয়োরটাকে খুঁজে পেতে বলল — "এই যে শূয়োর, চ চ, রাজা ডেকেছেন।" সিপাইরা শূয়োরকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল।

রাজা বললেন — "এই শূয়োর, তুই বিধবার অনেক কষ্টে করা জুমটা খেয়ে মাড়িয়ে তছনচ করে দিলি কেন? এই যে সিপাইরা, কতটুকু খেয়েছে?" সিপাইগণ — "ধর্মাবতার, ওটাকে আর জুম বলে চেনা যায় না।" রাজা — "এই যে ওরাও তো বলছে! কেন তুই খেলি? এখন তুই কি সাজা পেতে চাস্?"

শূয়োর বিনীতভাবে বলল — 'আপনিই বিচার করুন ধর্মাবতার, গরমকাল বলে আমি বিশ্রাম করছিলাম। লাল পিঁপড়েরা এসে আমায় কামড়ে দিলে আমি রাগে ঠিক থাকতে না পেরে বিধবার জুমে ধান খেয়েছি।"

রাজা বললেন — "তাই নাকি?"

শূয়োর বলল — "হ্যাঁ মহারাজ; তাই বটে।"

রাজার হুকুমে সান্ত্রিরা লাল পিঁপড়েদের ধরে আনতে গেল। খোঁজ-খবর নিয়ে লাল পিঁপড়েদের ধরে বাঁশের চোঙে পুরে নিয়ে এল। রাজার সামনে লাল পিঁপড়েদের এনে ছেড়ে দিলে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — "এই লাল পিঁপড়ের দল, তোরা নাকি শূয়োরকে ঘুমোবার সময় কামড়েছিস্? কি সাজা পেতে চাস্ এখন?"

লাল পিঁপড়েরা একসাথে বলে উঠল — "ধর্মাবতার,মহারাজ; গর্ত্তের ভেতর আমরা ডিম ও খাবারগুলো যত্ন করে গুজিয়ে রেখেছিলাম। মুরগী এসে আমাদের ডিমগুলোকে খেয়ে ঘেটে ঘুটে তছনচ করে দিলে। আমরা কিছুই করতে পারলাম না। তাই হাতের কাছে যাকে পেলাম তাকেই কামড়ে দিলাম।"

সান্ত্রিরা রাজার হুকুম পেয়ে মুরগীকে ধরে আনতে চলল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মুরগীর দেখা পেল।

সান্ত্রিরা বলল — "এই মুরগী, রাজা তোকে ডেকেছেন। এক্ষুণি যেতে হবে।" সবাই মিলে ধরে বেঁধে মুরগীকে রাজার কাছে এনে ছেড়ে দিলে।

রাজা বললেন — "এই মুরগী, তুই কেন লাল পিঁপড়েদের ডিম খেলি? বাসা তছনছ করে দিলি?"

মুরগী — "ধর্মাবতার, মহারাজই বিচার করুন। আমি ডিমে তা ডিচ্ছিলাম। হরিণ এসে আমার ডিমগুলো মাড়িয়ে গেল বলে আমি অন্যের যা পারি একটা কিছু ক্ষতি করে দিলাম।"

রাজা — "তাই নাকি?"

মুরগী — "যে আজ্ঞে মহারাজ, এরূপই বটে।"

রাজা বললেন — "যাও সান্ত্রিগণ, হরিণটাকে ধরে নিয়ে এস দেখি। সান্ত্রিরা আবার চলল। গিয়ে দেখা পেল হরিণের।

সান্ত্রিরা বলল — "এই হরিণ, রাজা ডেকেছেন। তোকে এক্ষুণি যেতে হবে।" হরিণ চলল রাজার কাছে।

রাজা বললেন — "এই হরিণ, তা দেওয়ার সময় তুই কেন মুরগীর ডিমগুলো মাড়িয়ে দিলি?

হরিণ — "দোহাই ধর্মাবতার, মহারাজ আমার দিন দশ মাস চলছিল। দু'এক দিনের মধ্যেই বাচ্চা দেব। গাছের ছায়াতে শরীর এলিয়ে বসেছিলাম। বলা নেই কওয়া নেই, গাছ থেকে আচমকা বানর একটা ফল ফেলল। পড়বি তো পড়, একেবারে আমার পিঠে। আমি হকচকিয়ে পালিয়ে যাবার সময় খেয়াল ছিল না বলে মাড়িয়ে দিয়েছি।"

মহারাজ - "তাই নাকি?"

হরিণ বলল — "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।"

রাজা বললেন — "সিপাইরা, যাও। সেই বনের বানরটাকে ধরে নিয়ে এস।"

সান্ত্রিরা আবার চলল বানরকে ধরে আনতে। গিয়ে বানরের দেখা পেল।

সান্ত্রিরা বলল — "এই বানর, রাজা ডেকেছেন তোকে। এক্ষুণি যেতে হবে।" বানরও থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে চলল।

রাজা বললেন —"এই বানর, তুই নাকি হরিণের পিঠে একটা ফল ফেলেছিস্?"

বানর — "আজ্ঞে মহারাজ, তা সত্যিই। আমি একটা ফল পেয়েছিলাম। ফলটা ভারী পছন্দ হল আমার। তাই হাতে নিয়ে লাফাচ্ছিলাম। আর গান গাইছিলাম —'আমি খাব কি ছেলে খাবে ... ফলটা ভারী গোল ... ইত্যাদি বলে। এমনি সময়ে হলুদ ধনেশ পাখিটা আচমকা

একটা হাঁচি দিলে। আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ফলটাও গেল ফসকে।"

রাজা বললেন —"অঃ — তাই নাকি?"

বানর বলল — "আজ্ঞে মহারাজ, এ রকমটাই হয়েছিল।"

রাজা — "নাঃ, সান্ত্রিরা; যাও আবার। ব্যাপারটা দেখছি বেশ ঘোরালো।" রাজার হুকুমে সিপাইরা আবার চলল। খুঁজে পেতে ধরল গিয়ে সেই ধনেশ পাখিটাকে।

সান্ত্রিরা বলল —"এই, এই হলদে ধনেশ; রাজার হুকুম; এক্ষুণি চল।" সান্ত্রিরা ধরে বেঁধে নিয়ে এল ধনেশ পাখিকে রাজার সামনে।

রাজা বললেন — "এই যে হলদে ধনেশ, হলদে ধনেশ, তুই কেন আচমকা হেঁচে দিয়ে বানরকে হকচকিয়ে দিলি?"

ধনেশ — "মহারাজ, সাত পথের বাঁকে সাত ডালা বট গাছের গর্ত্তে বসে ডিমে তা দিচ্ছিলাম। কোথাকার এক চামচিকে এসে আমার নাকের ভেতর ঢুকতেই। নাকের ভেতরটা কেমন, যেন করে উঠল। আর ঠিক থাকতে পারলাম না। আচমকা হেঁচে দিলাম।"

রাজা বললেন — "অঃ এই নাকি?"

হলদে ধনেশ বলল —"আজ্ঞে, ধর্মাবতার মহারাজ।"

রাজা বললেন —"নাঃ — যাও সান্ত্রিরা, সেই চামচিকেটাকে ধরে নিয়ে এস শীগ্‌গীর।"

সান্ত্রিরাও গেল। গিয়েই দেখা পেল।

সান্ত্রিরা বলল —"এই, এই চামচিকে, রাজা ডেকেছেন। তোকে এক্ষুণি যেতে হবে।" চামচিকে রাজার কাছে এল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন —"এই চামচিকে, তুই কেন হলদে ধনেশের নাকে ঢুকলি? তোর জন্যে কি আর জায়গা ছিল না?" চামচিকে বলল —"না—দেখুন ধর্মাবতার, মহারাজ; এদিকে ব্যাঙ আমাকে শাসাচ্ছে —

বাঁশে ঢুকলে চিড়ে খাব,
গর্তে ঢুকলে খুঁড়ে খাব—
উড়ে যাবিতো বাঁশ আছে, পেয়ে খাব;
যাবি কোথায়? তোকে খাবই খাব।

তাই দেখুন, আমি ভয় পেয়ে হলদে ধনেশের নাকের ভেতর পালিয়েছিলাম। কি আর করি মহারাজ!

রাজা বললেন —"এই সান্ত্রিরা, যাও — যাও, ব্যাঙকে নিয়ে এসগে।" সান্ত্রিরা আবার গেল। বিচারের দিন এমনিই চলল সেপাই-সান্ত্রিদের। সান্ত্রিরা জুমে গিয়ে পৌঁছল। এদিকে ব্যাঙ জুমের কোন এক গর্ত্তে ঢুকে মনের আনন্দে ডেকে চলছে।

সান্ত্রিরা বলল — "এই ব্যাঙ, তোকে রাজা ডেকেছেন। চ চ, এক্ষুণি চল।"

ব্যাঙ বলল — 'কেন ডেকেছেন?'

সান্ত্রিরা বলল — 'আগে চলনা তুই।' এই না শুনে ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে রাজার দরবারে গিয়ে পৌঁছল।

ব্যাঙ বলল — "মহারাজ, কেন ডেকেছেন আমাকে?"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — আচ্ছা ব্যাঙ, তুই নাকি চামচিকেকে খেতে চেয়েছিলি?"

ব্যাঙ বলল — "আজ্ঞে মহারাজ, ওর সাথে মতের অমিল হলে—

বাঁশে ঢুকলে চিড়ে খাব,
গর্তে ঢুকলে খুঁড়ে খাব—
উড়ে যাবিতো বাঁশ আছে, পেরে খাব;
যাবি কোথায়? তোকে খাবই খাব।

এ কথা বলেছি। "রাজা সান্ত্রিদের হুকুম দিলেন —"যাও ওকে দড়ি পাকিয়ে বেঁধে রাখ।" সান্ত্রিরাও আচ্ছা করে বেঁধে রাখল। রাজা বললেন দেখ ব্যাঙ, তোর একজনের জন্য কতগুলো লোক কষ্ট পেল — বকুনি খেল। বিধবার ধানগুলো খাওয়া গেল। আমার রাজ্যে কেউ কারো ক্ষতি করে না। তুই কেন করতে গেলি?" ব্যাঙের মুখে রা-টি নেই।

রাজা হুকুম দিলেন —"বন্দুকের হাতল দিয়ে ব্যাঙের কোমরে দাওতো কয়েক ঘা কষিয়ে।"

সিপাইদের হাতে বন্দুকের হাতলের মার খেয়ে ব্যাঙের কোমর গেল ভেঙ্গে। সেদিন থেকে ব্যাঙ আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। ❑

মুরগীর পিঠে

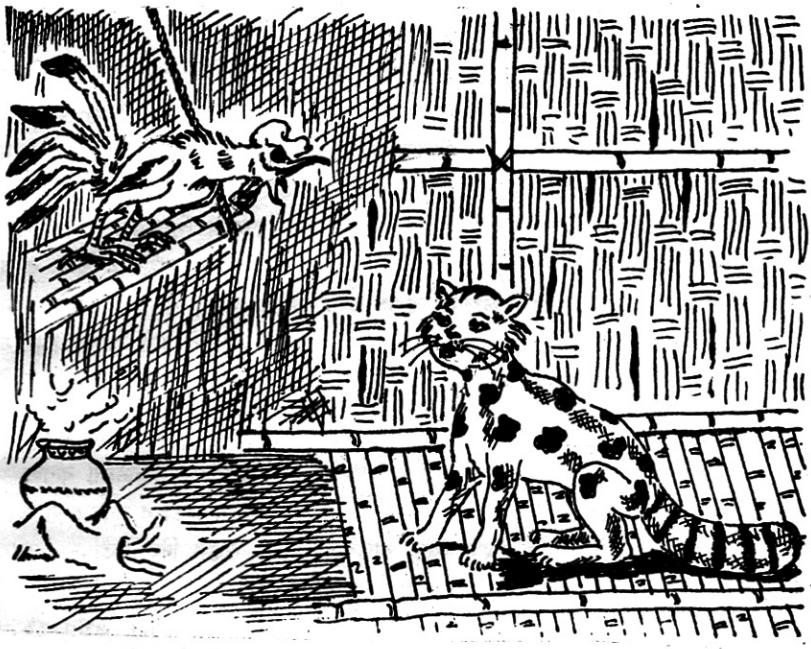

এক মুরগী। ছেলেপিলে আছে। একদিন ছেলেমেয়েরা বলছে — এবার আমরা একদিনও পিঠে খাইনি মা। আমাদের পিঠে খাওয়াতে হবে। 'হাঁ-হাঁ আজকেই খাওয়াব' — মুরগী স্নেহের চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে একবার তাকাল।

মুরগী উদুখল নিয়ে উঠোনে গিয়ে চাল গুড়ো করতে লেগে গেল। কাছে পিঠে কাউকে না পেয়ে আপন মনেই গুন্‌গুন্‌ করছিল। ঠিক তখুনি মুরগীর দাওয়ায় বিড়াল এল বেড়াতে। বিড়ালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় মুরগীর চাল গুড়ো করা হল — পিঠেও ভাজা হল।

বিড়াল মুরগীর বান্ধবী। পিঠে ভাজতে ভাজতেই মুরগী বিড়াল বান্ধবীকে কিছু খাইয়ে দিল। নিজের ছেলেমেয়েদেরও খুব করে খাওয়াল। যাওয়ার সময় বিড়াল বান্ধবীকে বলে গেল —"আমার ছেলেমেয়েরাও এবার পিঠে খায়নি মারে (বান্ধবী)। ওদেরকে পাঠিয়ে

দিচ্ছি। অল্প হলেও ওদের খাইয়ে দিও।' মুরগী বলল — 'তা পাঠাবে বৈকি; খাইয়ে দেব।' খেতে খুব স্বাদ হয়েছে বলে মুরগীর ছানারা একটা দু'টা করে সবগুলো পিঠে খেয়ে ফেলল। বিড়াল ছানাদের জন্য একটা পিঠেও থালাতে রইল না। ওদিকে বিড়াল বাড়ীতে গিয়েই ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিলো। পিঠে তো শেষ! এখন উপায়! মুরগী চট করে কিছু শূকরের বিষ্টা এনে বিড়াল ছানাদের খাইয়ে দিল। বিড়াল ছানারা কোনদিন পিঠে খায়নি বলে — কি খেল কিছুই বুঝতে পারল না। তেতো, ঝাঁঝ পিঠে খেয়ে কিন্তু ওদের মন ভরল না। বাড়ীতে গেলে বিড়াল, ছানাদের জিজ্ঞেস করল — মাসী তোদের কি কি পিঠে খাইয়েছে; তা কেমন খেলি বাচ্চারা?' ওরা বলল — পিঠে তা খেয়েছি, কিন্তু তুমি না বলেছিলে পিঠে খুব স্বাদ। আমরা যা খেলাম সে তো শুধু ঝাঁঝ, তেতো — একদম বিচ্ছিরি। কালো, গোল-গোল। বিড়াল তখন ভাবছে — তাইতো, আমি যা খেয়ে এলাম সেগুলো তো ভালই ছিল, তেল জবজবে। তা ওদের ঝাঁঝ, তেতো পিঠেগুলো খাওয়ানো কি উচিত হয়েছে। হয়ত ওদের পিঠেই দেয়নি। শূয়োর, মোরগের নাড়িটাই জড় করে খাইয়ে থাকবে। মুরগীর সাহসের বলিহারি! ওকে আমি দেখে নেব। বিড়াল তেলেবেগুনে জ্বলতে লাগল। রাগে দুঃখে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগল। মুরগীর হাড় মাংস চিবিয়ে খেলেই বিড়ালের হাড় জুড়াবে— নষ্টামোর উপযুক্ত সাজা হবে।

দিনের বেলা খেতে গেলে মুরগী পালিয়ে যাবে। রাত্তিরেই মুরগীর ঘাড় মটকাতে হবে। যেমন কিচ্ছুটি হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে এসে বিড়াল মুরগীকে জিজ্ঞাসা করল— "মারে, মারে, তুমি রাত্তিরে কোথায় ঘুমাও?" মুরগী কিন্তু বিড়ালের মতলব বুঝতে পারল। তাই সেও— যেন কিচ্ছুটি হয়নি এমনি করে বান্ধবীর কথার উত্তর দিল, 'তা — আর কোথায় ঘুমোব মারে! গরীব মানুষ। ভাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কোত্থেকে করব! তা' তুমি যখন জানতে চাইছ তখন বলছি, 'ওই ভিতর দিকের ছাদের (সীলিং) উপর ছেলে পিলেদের জড়িয়ে চোখ বুজে বসে থাকি। জায়গাটা বেশ গরম কিনা!"

রাত্তিরে মুরগী ছানাদের নিয়ে মস্তবড় একটা জালার ভেতর ঢুকে রইল। ছানাদের বলে রাখল, 'সাবধান, কেউ কিন্তু টু শব্দটি করতে পারবে না। কথা যদি বলতেই হয় কেউ যাতে না শোনে এমনি ফিস্ ফিস্ করে বলবে। ছানারাও 'আচ্ছা আচ্ছা' তাই হবে' বলে মার কথায় সায় দিল। ওরাও জালার ভিতরে সবে ঢুকেছে — এমনি সময়ে বিড়ালও মুরগীর খোঁজে এসে গেছে। ঘরে ঢুকেই বিড়াল চড়া সুরে বলতে লাগল—

সইকে খাব মি-উ,
সইকে খাব মি-উ,
সইকে খাব মি-উ

ঘরের আনাচে কানাচে খুব খুঁজে পেতে দেখল বিড়াল। কিন্তু কোথাও মুরগীর টিকিটিরও দেখা পেল না। বিড়াল রাগে ফুসতে লাগল। নাঃ — আজ আর পাওয়া যাবে

না দেখছি। বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল — এই যা, কোণের জালাটাতো দেখাই হল না। পা টিপে টিপে সে জালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে কারা যেন ফিস ফিস করছে। এ মুরগী আর ছানারা না হয়েই যায় না। 'জালা থেকে এক্ষুণি বেরহ' বলছি আজ তোদের চিবিয়ে খাব' — বিড়াল গর্জ্জে উঠল। মুরগী কিন্তু বিপদেও বুদ্ধি হারাল না। গলায় সুর নামিয়ে বিড়ালকে বলল,— 'তা, সই খেতে চাওতো খাবে। খেতে হলে আগুনে সেকে-পুড়ে খেতেই ভাল। উনুনে আগুনটা জ্বেলে নাও।' মুরগীর ছিল খুব বুদ্ধি। ঘুমুতে যাওয়ার আগেই একটা পঁচা ডিম উনুনে ছাই চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল। খানিকটা দূরে মস্ত একটা হাড়িতে অনেকগুলো সিঙ্গি মাছও জীইয়ে রেখেছিল।

রাগে বিড়ালের এতটুকু চিন্তা করবার সময় ছিল না। বলার সাথে সাথেই বিড়াল উনুনে আগুন জ্বালাতে গেল। এই ফাঁকে মুরগী যাতে সটকে না যায় সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। দু'একবার মুখ দিয়ে হাওয়া দিতেই আগুন জ্বলে উঠল। আর যায় কোথায়! সাথে সাথেই ছাইয়ের তলায় লুকানো ডিমটাও প্রচণ্ড শব্দ করে বিড়ালের চোখে মুখে ছিটকে পড়ল। চীৎকার দিয়ে বিড়াল কেঁদে উঠল। সব কিছুই ঝাপসা মনে হচ্ছে। কোন কিছুই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না। কেঁদে কেঁদেই সে মুরগীকে বলল, 'সই, ও সই, আমার চোখে দুটো যেতে বসেছে। জল কোথায় আছে তাড়াতাড়ি বল্। একটু জল দিয়ে ধুইয়ে দি।' —'তা ঘরের কোণে ওই বড় হাড়িতে আছে। ওখানেই ধুইয়ে নাও না। মুরগী উত্তর দেয়। বিড়ালের বাঁচি কি মরি অবস্থা। দৌড়ে গিয়ে হাড়িটার ভেতরেই মাথা ঢুকিয়ে দিলে। আর অমনি সিঙ্গি মাছগুলো বিড়ালের নাকে-মুখে-চোখে খুব করে কাঁটা ফুটিয়ে দিল। বিষের জ্বালায় বিড়ালের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে চীৎকার দিয়ে উঠল সে, "সই —সই, এবার বুঝি প্রাণেই মারা যাচ্ছি। কি করব এখন বল। 'তা ওই বেড়াটাতে চোখ দু'টো মুছে ফেল—'। মুরগী একটা বেড়া দেখিয়ে দিল। এই কদ্দিন হল গেরস্ত বেড়াটা তৈরী করেছে। কঞ্চিগুলো ছিলো খুব ধারাল। বিড়াল সত্যি সত্যি সেখানেই চোখ ঘষতে গেল। ঘষতে ঘষতে চোখের ঘাঁটা আরও বেড়ে গেল বিচ্ছিরিভাবে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একসময় বিড়াল মরে গেল। তখন থেকে মোরগ ছানাদেরও আর কোন ভয় রইল না। ❑

কথা বলা আংটি

দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক গাঁ। ও গাঁয়ে বুড়ো আর বুড়ীর এক ঘর। ওদের নাতি অছে দু'টো — ওদের সঙ্গেই থাকে। নাতি দু'টো একদিন জুমে গেল কাজ করতে। কাজের মরশুম। কাজ করতে করতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেল খেয়াল ছিল না। বড্ড খিদে পেয়েছে। কী যে খাই! জুমের পাশেই ছিল ঘুঘুর বাসা। দু'ভাই মিলে সে বাসা থেকে চারটে ডিম খেল।

দিনের শেষে ঘরে ফিরে এল দু'ভাই। এসে ঠাকুরমাকে বলল, "আচুই, আচুই, (ঠাকুরমা, ঠাকুরমা) জুমে কাজ করতে করতে খিদে পেলে আমরা আজ ঘুঘু পাখির ডিম খেয়েছি! সত্যি ডিমগুলো খু-ব স্বাদ, খেলে জিভে লেগে থাকে।

ওদের ঠাকুরমা বলল —"তা' আমার জন্য আনলে না কেন? আমিও দু'টো

খেয়ে দেখতাম। অনেক দিন হল আমিও খাইনি।" বুড়ো-বুড়ী প্রসঙ্গটা সেখানেই চেপে গেল। একসময় ছেলে দু'টো যখন ঘরে নেই তখন বুড়ো-বুড়ী বলাবলি করছে —"মা-বাবা মরা ছেলে দু'টো, ওদেরকে আমরা কতই না আদর করি। ভাল মন্দ কিছু একটা হলে ওদের না দিয়ে মুখে দিই না। আর, ওরা কিনা আজ দিব্যি জুমে গিয়ে ঘুঘুর ডিম খেয়ে এল। দাদু দিদির জন্য একটা ডিমও নিয়ে এল না। আপদগুলোর বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই দেখছি। ওরা জুমে যাক আর একদিন। ওরা জুমে গেলে আমরাও বড় তেলালো শূয়োরটা কেটে খাব। রাক্ষসগুলোর জন্য এক টুকরোও রাখব না।

যেমনি কথা তেমনি কাজ। পরদিনই দু'ভাই জুমে গেলে বুড়ো-বুড়ী দু'জনে মিলে বড় তেলালো শূয়োরটা কেটে বসল। ছেঁচে ছুলে মাংস কাটার সময় দু'ভাই জুম থেকে এসে হাজির। ওদের দেখে বুড়ো-বুড়ীর চোখ ছানাবড়া! দু'জনে বলাবলি করছে —"আপদগুলোকে না দিয়ে খেতে চেয়েছিলাম; এসে গেছে দেখছি। আচ্ছা, আচ্ছা, রোসো, একটা বুদ্ধি বের করছি।"

দু'ভাই জুম থেকে এসে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করছে — "আমাদের না বলে শূয়োর কাটতে গেলে কেন ঠাকুরমা?" ঠাকুরমা উত্তর দেয় —"কেটেছি বেশ করেছি; খাব বলে। আচ্ছা, এখন যা দেকিনি, নাড়ীভূড়ীগুলো চট করে চিরে ধুয়ে মুছে নিয়ে আয় দেকিনি।' দু'ভাই চলে গেল ভূড়িগুলো ধুয়ে আনতে। এদিকে ওরা চলে গেলে বুড়ো-বুড়ী মাংস রেঁধে তাড়াহুড়ো করে সব খেয়ে ফেলল। যেটুকুন খেতে পারল না, লুকিয়ে রাখল। ওদের জন্য এক টুকরো মাংসও রইল না। কাজ সেরে এসে দু'ভাই দেখে ওদের জন্য এক টুকরো মাংসও নেই। তাইতো, এতগুলো মাংস কোথায় গেল। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করল —"ঠাকুরমা, আমাদের মাংস কোথায়!" "তোদের আবার কি জন্যে" — বুড়া খেঁকিয়ে উঠল। "ঘর থেকে বেরিয়ে যা আপদগুলো। তোদের মনে দয়ামায়া নেই।" এই বলে বুড়া তার নাতিদুটোকে ঘর থেকে বের করে দিল।

ঘর থেকে বের করে দিলে ছেলে দু'টোও আর এ গাঁয়ে থাকবে না বলে ঠিক করল। আশ্রয়ের খোঁজে ভিন গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ল। বনের ভেতর দিয়ে পথ। তখনকার পাড়াগুলোও ছিল খুব দূরে দূরে। মানুষও ছিল এখনকার চাইতে অনেক কম। যেতে যেতে বেলা শেষে ওরা এক জায়গায় গিয়ে থামল। খিদে তেষ্টায় দু'জনেই অবসন্ন, পা আর চলছে না। কাছে পিঠে খাবার মত কিছুই খুঁজে পেল না। পাশেই একটা বিরাট গাছ; উপরে পাখির বাসাও দেখা যাচ্ছে অনেক। উঠে দেখতে হয় বৈকি! দু'একটা হয়ত পাওয়া যেতে পারে। ওদের মধ্যে একজন তরতর করে গাছে উঠে গেল। এ বাসা ও বাসা হাতড়িয়ে কয়েকটা ডিম পেলও বটে — তবে শকুনের। পেটের খিদের আর তর সইছিল না। তাই একটা ডিম ফেলে দিলে মাটিতে ছোট ভাইয়ের জন্য। মাটিতে পড়েই ডিমটা চৌচির হয়ে গেল। ছোট ভাইয়ের আর ডিম খাওয়া হল না। ওদিকে গাছে বসে যে শকুনের ডিম খেয়েছিল — কি জানি কেন, আস্তে আস্তে সে শকুন হয়ে গেল। কি আর করবে!

শকুন তখন তা'র ছোটভাইকে গাছের উপর থেকে বলছে, "ভাই, দেখতেই পাচ্ছিস, আমি শকুনের ডিম খেয়ে শকুন হয়ে গেছি। মানুষের সঙ্গে আর থাকতে পারব না; শকুনের দলেই যেতে হবে এখন।" দাদার কথা শুনে ছোটভাই উপর দিকে চেয়ে কেঁদে কেঁদে বলছে, "আমি একা কি করে থাকব দাদা? এদিকে লোকজনও দেখছি না —বনও খুব গভীর।" শকুন হলে কি হবে, মনে কিন্তু ছোটভাইয়ের জন্য আগের মতই মায়া রয়েছে। উপর থেকে সে বলল, "আমি চলে গেলেও তোকে গাঁয়ের কাছে পৌঁছে দেব। তুই একটা কাজ করিস, আমি উপর দিয়ে উড়ে যাই, তুই আমাকে দেখে দেখে চলে আয়।"

শকুন উপর দিয়ে উড়ে চলল। ছোটভাই উপর দিকে চেয়ে জঙ্গলের পথ বেয়ে এগুতে লাগল। খানিক বাদেই শকুন ছোটভাইকে এক বিধবার জুমে পৌঁছে দিয়ে চিরদিনের মত চলে গেল।

জুম হলে কি হবে — সে শুধু নামেই। আবাদও হয়নি ততটা। ফসলও খুব অল্প। টং ঘরের খুঁটির চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও। এক গরীব বিধবার জুম কিনা — তাই এ হাল। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সারাদিনের ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছে ছেলেটি। তা হোক, কিছু একটা পেটে দিতে হবে ভেবে ছেলেটি ঢুকে পড়ল খাবারের খোঁজে। অনেক খুঁজে পেতে একটা ফুটি পাওয়া গেল। সে জুমে ওই একটাই ফুটি ফলেছিল। ছেলেটি তাই খেয়ে নিলে। যা হোক পেটে তো কিছু পড়ল, এবার ঘুমোব কোথায়? লতাপাতা কুড়িয়ে গাছের নীচেই এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর রাতে ছেলেটি স্বপ্ন দেখছে — এক দেবতা এসে তাকে বলছে "বাবু, রাত ভোরে বিধবার জুমের পাশের বাঁশঝাড়টি খুঁড়ে দেখবে। ওখানে একটি জিনিষ পাবে। তা তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দিও, কাজে লাগবে।" ভোর না হতেই দেবতার কথামত সে ওই বাঁশঝাড়টা খুঁড়ে দেখল। কি আশ্চর্য! ওখানে একটা সোনার আংটি! এ আংটিটা কিন্তু সাধারণ আংটি নয়। সে কথা বলতে পারে। বলে দিলে, কোন কাজই তার অসাধ্যি নেই —সব কাজই করতে পারে। ছেলেটি হাতের আঙ্গুলে আংটিটি পরে রাখল।

রাত ভোর হতেই বিধবা এল জুম দেখতে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল ফুটিটা নেই। সে আপন মনেই বলতে লাগল — "আমি বিধবা, কাজ করার লোকও নেই। অন্যদের জুমের মত আমার জুমও ততটা বাড়-বাড়ন্ত নয়। অফলন্ত সময়ে একটি ফুটি ফলেছিল — তাও বুঝি কে খেয়ে নিলে।" এমনি সময়ে ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল — "মা তোমার ফুটিটা আমিই খেয়েছি। দুদিন হল পেটে কিছু পড়েনি। তাই খেতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে বকো না।" বিধবা বলে — "তুমি যখন আমাকে মা বলে ডেকেছ, তখন আর কি করি। খেয়েছ তো খেয়েছ। আমার ছেলেমেয়ে কেউ নেই। আজ থেকে তুমিই আমার ছেলে। তুমি না খেলে কে খাবে বল?" ছেলেটিও বলল —"আমারও কেউ নেই মা। আমি তোমার এখানেই জুম আগলিয়ে থাকব, শুধু দু'বেলা দু'মুঠো আমাকে খেতে দিও। " দু'জনেই দুজনকে ভালবেসে ফেলল।

বিকেল বেলা বিধবা বাড়ী ফেরার সময় ছেলেকে বলছে —"বেলা যাচ্ছে বাবা, চল এখন বাড়ী যাই।" "না—মা, আমি এখানেই জুমে আগলিয়ে থাকব। তুমি যাও'— ছেলেটি বলল। "আগলাও আর যাই কর, কাল ভোরে এসেও তো করতে পারবে। একটা টং ঘরও নেই, রাত বিরেতে কি করে থাকবে এখানে?" — স্নেহের কণ্ঠে বলল মা। ছেলে কিন্তু কিছুতেই গেল না। মাকে সে বুঝিয়ে বলল —"তুমি ভয় পেও না মা। আমি এখানে বেশ থাকতে পারব, দেখে নিও। তুমি ঘরে ফিরে যাও।" বিধবা দুশ্চিন্তা নিয়ে একাই বাড়ী ফিরে গেল। বিধবার জুমে ছেলেটি একাই রয়ে গেল।

রাত হয়েছে। কেউ কোথাও নেই। এবার ছেলেটি তার আংটিকে ডেকে বলছে — "শোন আংটি, আমার এখানে থাকার জায়গা নেই দেখতেই পাচ্ছ; আমাকে এক্ষুণি একটা "গায়রিঙ' (টং ঘর) বানিয়ে দাও দিকিনি।" সঙ্গে সঙ্গেই আংটি খুব সুন্দর একটা 'গায়রিঙ' বানিয়ে দিলে। ঘর গেরস্তালীর সব জিনিষ-পত্তর একে একে সাজিয়ে রাখল ভেতরে। ছেলের আদেশ মত বিধবার জুমটাকেও আরও বড় করে শাক সব্জী, ফসল দিয়ে সাজিয়ে দিলে। নতুন জুমটা পুরোনোটার চাইতে চারগুণ বড় হয়ে গেল। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছেলেটি সে রাত টং ঘরে উঠেই কাটাল।

পরদিন রাত ভোর হতে না হতেই বিধবা জুমে ফিরে এল। ছেলে একা একা জুমে রয়েছে — কত কিছু বিপদই তো হতে পারে। তাই দূর থেকেই দেখছে আর ভাবছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে যেন চিনতেই পারছে না তার জুমটাকে। আগে তো তার জুমে 'গায়রিঙ' ছিল না। কি করে উঠল! পুরোনো জুম আর নেই, খুব বড় হয়ে গেছে দেখছি। জুমে ফসলও দেখছি প্রচুর। সবই অবাক লাগছে তার কাছে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে টং ঘরের উপরে গিয়ে ছেলের দেখা পেল। অবাক হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা পরল —"আচ্ছা বাবা, তুমি কি করে এক রাতের মাঝে এত বড় একটা টংঘর তুলতে পারলে?" "তা এমনিতেই তুলেছি মা," এই বলে সে চেপে গেল। আর কিছুই বলল না সেদিন। এখন থেকে বিধবার থাকা খাওয়ার কোন কষ্ট রইল না। মা ছেলে খুব সুখেই থাকতে লাগল।

ধান কাটার বাকী আছে কিছুদিন। "বালা কামাদি" (ধান কাটার পূর্বে দেয় পূজা) দিতে হবে। অচাই (পুরোহিত) ডাকতে গেল বিধবা পুরানো পাড়ায়। পুরোহিত বিধবার ওখানে পূজো দিতে চায় না। কেননা, বিধবার ওখানে গেলে মদ তো দূরের কথা, একবেলা খেতেও পায় না। বিধবা খুব অনুরোধ করে দিয়ে এল অচাইকে। ওদিকে ছেলে আংটিকে বলে পূজোর জিনিষ পত্তর সব সাজিয়ে রেখেছে। অচাই এসে পূজো দিল। পূজোর শেষে তাকে ভাল করে এক পেট খাইয়ে দিল। এসব দেখে অচাই মনে মনে ভাবছে —তাইতো, বিধবার তো চালচুলো কিছুই ছিল না। রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে দেখছি। সেও গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে বলতে লাগল —"তোমরা বিধবার জুমে গিয়ে দেখ, ওর আগের মত আর অভাব নেই। এখন সে গাঁয়ের সবার চাইতে ধনী। জুমের ধানও গিয়ে দেখ কত—কত! অচাইর কথায় যারা দেখতে এল ওরাও দেখল — হ্যাঁ ঠিকই তো।

একদিন ছেলে তার মাকে একটি লাঙ্গা বানিয়ে দিল। বিধবাও লাঙ্গাটি নিয়ে পুরোনো গাঁয়ে আসে যায়। সে গাঁয়ের চকদ্রি'র (গাঁয়ের প্রধানকে 'চকদ্রি বা চৌধুরী' বলা হয়) একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে দেখল লাঙ্গাটি। "বাঃ — এত সুন্দর লাঙ্গা তো আর কখনও দেখিনি।" তারও এমন একটি লাঙ্গা পেতে ভারী ইচ্ছা। সে একদিন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করে বসল "তুমি এত সুন্দর লাঙ্গা কোথায় পেলে মাসী? কে তোমাকে বানিয়ে দিয়েছে। আমি এমন একটা লাঙ্গা পেলে — আমাকে একটা বানিয়ে দাও না।" "আমার ছেলে বানিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, ওকে বলে দেখি।" বিধবা বলে, চকদ্রির মেয়ে একদিন ছেলে নিয়ে এসে বেড়িয়ে যেতেও মাসীকে বলে দিল। জুমে ফিরে এসেই বিধবা তার ছেলেকে সব বলে শোনাল। ওকে গাঁয়ে যেতেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, একথা বলতেও ভুলল না। ছেলে কিন্তু কিছুতেই গাঁয়ে যেতে রাজী হল না। একদিন চকদ্রির মেয়েই বেড়াতে এল তার মাসীর সঙ্গে বিধবার জুমে। জুমে বিধবার ছেলের সঙ্গে তার দেখা হল। একথা সেকথার পর চকদ্রির মেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করল — "আমাকে একটা বানিয়ে দেবে?" ছেলেটি হেসে উত্তর দেয় —'তা দেব বৈকি! সময় হলে নিশ্চয়ই দেব।"

জুমের ধান পেকেছে। প্রচুর ধান হয়েছে। "হ্যাঁ বাবু, ধান তো পেকেছে। কখন কাটবে?" বিধবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল। ছেলে বলল — তা' তুমি চিন্তা করোনা মা। সময় হলে কাটবখ'ন। সে রাত্তিরেই ছেলে আংটিকে বলছে —"দেখ আংটি, জুমের ধানতো পেকেছে। এবার কেটে মেরে ঘরে উঠাও দেখিনি।" আংটিও এক রাতের মধ্যেই জুমের সমস্ত ধান কেটে মেরে ঝেড়ে ঘরে উঠিয়ে দিলে।

এদিকে বিধবার জুম থেকে ফিরে আসা অবধি চকদ্রির মেয়ের মুখে হাসি নেই। দিন রাত যেন কি ভাবছে। মেয়ের কি হল — তা নিয়ে বাপ মায়েরও চিন্তার শেষ নেই। বিয়ে দিলে হয়ত ভালও হতে পারে — এই ভেবে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

আগের দিনের বিয়ে থা' কিন্তু আজকের মত ছিল না। গাঁয়ের সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করতে হলে গাঁয়ের ছেলেদের কোন একটা শক্তির পরীক্ষা দিতে হত। পরীক্ষা উতরিয়ে শক্তিশালী ছেলেটিই পেত সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করতে। চকদ্রিও তাই ঘোষণা করে দিল — "যে শক্তিশালী যুবক এক হাত দিয়ে একটা শূয়োর মেরে কেটে, ছেঁচে-ছুলে সবাইকে খাওয়াতে পারবে তার সাথেই তার মেয়ের বিয়ে হবে।"

"ছিক্রা পতলকে"র (বিয়ের জন্য ছেলেকে যে শক্তির কিংবা বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হয় তাকেই বলা হয় 'ছিক্রা পতলক"। এধরনের পরীক্ষা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকত।) দিন গাঁয়ের শক্তিশালী ছেলেরা সবাই এসে জড় হল চকদ্রির বাড়ীর উঠোনে। মজা দেখতে নারী পুরুষের সংখ্যাও হল প্রচুর। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিধবাও এসেছে। এদিকে চকদ্রি সবচেয়ে শক্তিশালী শূয়োরটাকে খাঁচায় পুরে রেখেছে। গাঁয়ের যুবক ছেলেরা একে একে খাঁচায় ঢুকে

নিজেদের শক্তির পরীক্ষা দিতে লাগল। কেউবা নাকে মুখে আচড় খেল, কেউবা হাতে পায়ে ব্যথা পেয়ে ফিরে এল। দু' একজনতো শূয়োরের কাছেই ঘেষতে পারল না। একে একে সবাই মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে বাধ্য হল। কেউ শূয়োরটাকে কাবু করতে পারল না। তাই চকদ্রি পরিহাস করে গাঁয়ের ছেলেদের বলছে "এতো দেখছি একেবারে ভারী লজ্জার কথা। আমার গাঁয়ের ছেলেরা দেখছি একেবারে শক্তিহীন। গাঁয়ের মেয়েকে ওরা গাঁয়ে রাখতে পারলে না। আমাকে বাধ্য হয়ে এখন ভিন গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদের ডাকতে হবে"। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে — "আমরা তো সবাই চেষ্টা করে দেখলাম। বিধবার ছেলেটি কিন্তু এখনও দেখেনি। ওতো আমাদের গাঁয়েরই ছেলে"। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে একজন তাই ওকে বলছে —"তুমি কেন চেষ্টা করে দেখলে না ভাই, তোমাকেও দেখতে হবে বৈকি! তুমিও তো গাঁয়েরই ছেলে। —"না, না আমি দেখব না ভাই। তোমরা সবাই যা পারলে না, আমি কি তা পারব"? বিধবার ছেলে উত্তর দেয়। গাঁয়ের ছেলেরা কিন্তু ওকে ছাড়ল না। জোর করে ঢুকিয়ে দিল খাঁচার ভেতর। ঢুকিয়ে যখন দিয়েছে কি আর করবে সে। এদিক ওদিক দু'একবার দেখে নিল ভাল করে। তারপর জুতসই জায়গা বেছে নিয়ে আচমকা শূয়োরটার একটা পা ধরে ফেলল এক হাতে। আর যাবে কোথায়? দু'একটা পাক দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েই পা দিয়ে শূয়োরটার গলা চেপে ধরল। অন্য পায়ে চেপে ধরল পেছনের পা দুটো। ধীরে ধীরে শূয়োরটা ক্লান্ত হয়ে এল। সুযোগ বুঝে বিধবার ছেলে শূয়োরটার বুকে প্রচণ্ড এক ঘা বসিয়ে দিতেই শূয়োরটা মরে গেল। উপস্থিত সবাই বিধবার ছেলের শক্তির তারিফ করতে লাগল। এবার বিধবার ছেলে এক হাতেই শূয়োরটাকে ছেঁচে-ছুলে রান্না করে সবাইকে পরিবেশন করে খেতে দিল। গাঁয়ের চকদ্রি খুশি হয়ে 'অচাই' ডেকে পূজো দিয়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে খুব জাঁক করে ওদের দু'জনের বিয়ে দিয়ে দিল।

সেদিন থেকে দশ গাঁয়ের সেরা দু'কুড়ি ছ'ঘরের এক ঘর হয়ে ওরাও সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে লাগল। ❑

এক ফালি লাউয়ের গল্প

ওরা দু'বোন। দু'বোনেরই বিয়ে হয়েছে। ছোট বোনের অনেক টাকা পয়সা, সোনাদানা। বড়বোন খুব গরীব। এবাড়ী ওবাড়ী ভিক্ষে করে খায়। তার কথা বলতে গেলে ঠিক এভাবে বলতে হয় —

দুঃখীজনের দুখের কথা কোথায় বলি ভাই।
চোখের জলে বাণ ডেকে যায় বলতে যদি চাই।।

একদিন বড় বোন ছোট বোনের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। ছোট বোনের কাছে যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় এই আশা নিয়ে। ছোট বোন দিলেও বটে। এক ফালি লাউ দিয়ে একবেলা চলতে পারে মত চাল। তার বেশী নয়। অঢেল টাকা পয়সা থাকলে কি হবে, ছোট বোনের মনটা ছিল ভারী খারাপ। বড় বোনকে অমনিতেই দিয়ে দেবে একবেলার চাল! না, তা হবে না। ওকে দিয়ে চালের বদলে যাহোক একটা কিছু করিয়ে নিতে হবে।

দু'জন দু'জনের উকুন বেছে দিচ্ছে। ছোট বোনই প্রথম দেখল বড় বোনের মাথা। বড় বোন গরীব। মাথায় তেল নেই, চিরুণীও পড়ে না। ছোট বোন বড় বোনের মাথায় উকুন পেল। "এবার আমার মাথাটা বেছে দাও দিকিনি" বলে ছোট বোন মাথা এগিয়ে দিলে। বড় বোন ছোটর মাথায় উকুন পেল না। কিন্তু ছোট বোন নিজেই নিজের মাথা আঁচড়াতে গিয়ে একটা উকুন পেয়ে গেল। উকুন পেয়েই সে মনে মনে ভাবতে লাগল — দিদি দেখছি আমাকে ঠকাতে চাইছে। একবেলার খাবার পেয়েই খুশীতে ডগমগ, কাজের বেলা দেখছি কিছুই নেই। আচ্ছা, রোস, রাক্ষুসীটাকে মজা দেখাচ্ছি। রাগে ফুলতে লাগল ছোট বোন। যাবার সময় ছোট বোন এক ফালি লাউ দিয়ে যে ভেট দিয়েছিল বড় বোনের হাত থেকে তাও কেড়ে রেখে দিল। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে ছেলেপিলেদের অমঙ্গল হবে। তাই সামনের দরজা দিয়ে বেরুতে দিলে না — পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বড় বোন আর কি করবে! কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

বাড়ী যাবার পথ। চোখের জলের বিরাম নেই। ঘরে ছেলেমেয়েরা সারাদিন না খেয়ে আছে। পথের পাশে বুনো কচুবন। যাবার পথে ওগুলোই একমুঠো তুলে নিল রেঁধে খাবে বলে। বাড়ীতে গিয়ে বুনো কচুর ডাঁটাগুলোই কেটে কুটে উনুনে চাপিয়ে দিলে। যাহোক একটা কিছু পেটে পড়বে এই ভেবে। সারাদিন কিছুই খেতে পায়নি। খুবই ক্লান্ত। অদৃষ্টকে দোষারোপ করতে করতে একসময় উনুনের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমনি সময়ে দেবতা এসে ওকে স্বপ্নে বলল —"দেখ্ মা, তোর অবস্থা দেখে আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। আমি আর কি করতে পারি। উঠে দেখ, তোর কচুগুলো সব সোনা করে দিয়েছি। এগুলো বেচে ছেলেপেলেদের নিয়ে সুখে থাকিস।" দেবতার আদেশ পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠল সে। উঠেই দেখল উনুনে চাপানো কচুগুলো সেদ্ধ হতে হতে কখন জানি সোনা হয়ে গেছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখল; হাঁ সত্যিই তো, কড়াইতে চাপানো কচুগুলো দেখছি সব সোনা হয়ে গেছে। সেও একতাল সোনা বেচে একদিনেই ধনী হয়ে গেল। ঘরদোর সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল।

একদিন ছোট বোন তাড়িয়ে দিয়েছিল — কথাটি সে আজও ভুলেনি, খুব মনে আছে। দেবতার দয়ায় তারও আজ সুযোগ এসেছে। তাই তার ঘরদোর এসে দেখে যেতে ছোট বোনকে খবর পাঠাল। বড় বোনের অবস্থা ফিরে যাওয়ার কথা ছোট বোন লোকের মুখে শুনেছিল। তা' নিজের চাইতে বেশী কি কম — নিজের চোখে পরখ করে দেখতে ছোট বোন একদিন বড় বোনের বাড়ীতে বেড়াতে এল। বড় বোনের সোনাদানা হাল অবস্থা দেখে ছোট বোন খুব খুশী হল। দু'বোন সারাদিন একসাথে খাওয়া-দাওয়া করল, কত কথাই বলাবলি করল। বাড়ীতে ফিরে ছোট বোনও দিদিকে 'একদিন এসে বেড়িয়ে যেয়ো' খবর পাঠাল। বড়বোন এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সেও একদিন ছোট বোনের বাড়ীতে এল। বড় বোন তার সব সোনার অলংকারগুলো গায়ে পরে ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়েই এসেছিল। বড়বোন এসে পৌঁছুতেই ছোটবোন সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে 'এস, এস, ঘরে এস'; বলে

দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাত হয়ে গেল। ছেলে এসে খেতে বসলে শুধু ভাতই এনে ছেলের সামনে বেড়ে দিল। তরকারি রাঁধেনি এক বিন্দুও। শাক সব্জীও ঘরে বাড়ন্ত। "ছেলে ঘরে এলে দাম দেব" বলে জেলেদের কাছ থেকে মাছ রেখে খানিকটা ঝোল রেঁধেছিল তা ছেলেও সময় মত ঘরে ফিরেনি জেলেদের মাছের দামও দিতে পারে নি বলে ওরা মাছ দিয়ে রাঁধা তরকারিটুকু অবধি নিয়ে গেছে। খানিকটা ঝোল এখনও হাঁড়ির তলায় পড়ে আছে। তা-ই বাটিতে করে এনে ছেলেকে খেতে দিল। ঝোল খেয়ে ছেলে খুব স্বাদ পেল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করল— "এ কিসের ঝোল মা? এমন স্বাদের তরকারী তো কখনও খাই নি।"

মায়ের মুখে রা নেই। শেষ পর্যন্ত ছেলের কথায় বলতেই হল। চোখের জল ফেলে মা বলতে লাগল — "আজ দুপুরে হাতে কাজ ছিল না, দাওয়ায় বসে আছি। এ পথ দিয়েই এক জেলে যাচ্ছিল মাছ নিয়ে। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই বললাম — "তা কিছুটা রাখতে পারি, কিন্তু ছেলে ঘরে না এলে দাম পাবে না। তাতেই রাজী হল সে। কিছু মাছ দিয়ে গেল। মাছগুলো কেটে কুটে রেঁধে তোমার পথ চেয়ে আছি। এদিকে জেলেও ফিরে এসে মাছের দাম চাইল। তার যাবার তাড়া। কি আর করব! তুমিও আসনি, আমার হাতেও কানাকড়ি নেই। তা রাঁধা তরকারিগুলোই জেলেকে ফিরিয়ে দিতে হল।

এসব শুনে ছেলে বলল — "ঘরেতো এক আঁটি লাক্‌ড়ি রয়েছে। তা' কাল বনে যাচ্ছি না। ওগুলো বেচেই চাল নিয়ে আসব। আর দুপুরবেলা রাজার পুকুরে গিয়ে বড়শী ফেলব — দু'একটা পেয়ে যাই তো খেতে পারব।"

মা বলল — "রাজার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে বকুনি খেয়ে মর আর কি।" ছেলে বলল — "কত লোকই তো বড়শী ফেলে মাছ ধরছে মা। কাউকে কিছু বলে না — কেউ মানাও করছে না। আমাকেই কেন বলতে যাবে? যদি কেউ বারণ করে — ফিরে আসলেই হবে। তুমি কিছু ভেবো না।

পরদিন খুব ভোরে লাক্‌ড়ির আঁটিটা বেচে চাল কিনে আনল ছেলেটি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে পুকুরের এক কোণে গিয়ে বড়শী ফেলে বসে রইল। সারাদিন বসে রইল চোখ টাটিয়ে — একবারও খেল না কিছুতে। খালি হাতেই ফিরতে হবে তাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড়শী উঠাতে যাবে - এমন সময় কোত্থেকে একটা রাজহাঁস এসে ওর বড়শীটাকে খেয়ে ফেলল। খাওয়া মাত্রই বড়শীটা টেনে তুলল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল একবার, কেউ নেই। যারা বড়শী ফেলেছিল, সবাই যে যার মত চলে গেছে। সুযোগ পেয়ে সেও রাজহাঁসটি গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে বাড়ী নিয়ে এল। সে রাজহাঁসটা ছিল — রাজার পোষা হাঁস।

রাজহাঁস দেখেই মা আঁৎকে উঠল। খুব ভয় পেয়ে সে ছেলেকে বলল — "বাবা, এতো দেখচি রাজহাঁস। তুমি চুরি করে এনেছ। যেখান থেকে এসেছ ওখানেই এটাকে রেখে

ধনেশ পাখির গল্প

বুড়ো-বুড়ীরা যেমনি বসে থাকে — ঠিক তেমনি বসে থাকে; লম্বা ঠোঁট, বিরাট শরীর পাখিটাকে তোমরা হয়ত দেখে থাকবে। সে পাখিটার নাম ধনেশ পাখি। অনেক প্রাচীনকালে পৃথিবীতে ধনেশ পাখি ছিল না। কোন এক সময় শাপগ্রস্ত হয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে। সে গল্পটা হল এ রকম।

অনেক আগের দিনে দূর পাহাড়ের গাঁয়ে এক গেরস্ত জুম চাষ করত। তার নাম ছিল কচাক রায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার। স্ত্রীর নাম ছাম্পারী। স্ত্রী ছাম্পারী কাজ-কর্মে খুবই ভাল। ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁয়ে ওর মত আর একটিও মেয়ে নেই।

কচাকদের জুম খুব বড়। জুমের পাশেই ওদের ঘর। জুমে ফসলও হয় অনেক। কিন্তু এত ভাল জুম হলে কি হবে, কচাক কিন্তু এদিকের কুটোটিও ওদিকে নেয় না। রাজ্যের সেরা আলসে। মদ পেলেতো কথাই নেই — দিনরাত তা নিয়েই থাকে। তা না হলে বারান্দার দাওয়ায় বসে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি বাঁশি বাজাবে। ওদিকে স্ত্রী

ছাম্পারী সমবয়সীদের নিয়ে কাজ করে। জুম পরিষ্কার থেকে সুরু করে ঘরে ফসল তোলা অব্দি — সব কাজ এক হাতেই করতে হয়। ঘরে এসেও তার বিশ্রাম নেই। রান্না-বান্না করতে হয় — স্বামীকে খাওয়াতে হয়। কচাক ছিল খুব বদমেজাজী। ছাম্পারী এতটুকু করেও ওর মন পেত না। পান থেকে চুণ খসলেই ও রেগে যেত, ছাম্পারীকে খুব করে বকুনি দিত। তবু ছাম্পারি কচাককে ভালই বাসত। ও রেগে গেলেও ছাম্পারী কিন্তু একবারও রা-টি করত না।

সুখ দুঃখে ছাম্পারীর দিন যায়। ছাম্পারী মা হবে। আজ হবে কি কাল হবে। ছাম্পারীর মন খুসিতে ভরপুর; ছেলে হলে কি নামে ডাকবে, কেমন করে পিঠে নিয়ে বেড়াবে এসব চিন্তাতেই দিনরাত মশগুল হয়ে থাকে। এমনি দিনে ছাম্পারীর ঘরে একটি ছেলেও হল। ছেলেতো নয় যেন একটি সোনার চাঁদ — 'মগদাম' (ভুট্টা) এর মত গায়ের রং।

কাজের মরশুম এসে গেছে। জুমের কাজে যেতে হবে। নয়ত আসছে বছর খাওয়া জুটবে না। এদিকে ছেলেটি এখনও খুব ছোট। পিঠে বয়ে নেবার মতও হয়নি। কিন্তু কাজে যে যেতেই হবে। কাজেই ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে ছাম্পারী রোজ কাজে যায়।

সেদিনও ছাম্পারী ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে কাজে গেল। যাবার সময় কচাককে বারবার বলে গেল ছেলের দিকে নজর রাখতে।

সেদিন কি জানি কেন ছাম্পারীর মন জুমে যেতে চাইছিল না। কিন্তু তবুও যেতে হল। আজ অংজাকতি ওদের জুমে কাজ হবে। ওদের জুম ছিল খুব দূরে। ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও ছাম্পারী ছেলের দিকে নজর রাখতে কচাককে বলে গেল। কচাকও "হাঁ-হাঁ, দেখব" বলে ছাম্পারীর কথার উত্তর দিল।

এদিকে ছাম্পারীও ঘর থেকে বেরিয়েছে — কচাকও রোজ দিনের মত পশ্চিমের বারান্দায় বাঁশি নিয়ে গিয়ে বসল। ওদের গায়াঙি-এর দরজা ছিল পূর্ব দিকে। ওদিক দিয়েই ছিল টংঘরে আসা যাওয়ার পথ।

ওদের ঘর থেকে খানিক দূরেই ছিল একটা বাঁশঝাড়। সেখান থেকেই ঘন বন শুরু। এত ঘন বন — দিনেই রাতের আঁধার নেমে থাকে। ভালুক, বনকুকুর, বাঘেরা সে বনেই দল বেঁধে থাকে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল একটা ভালুক। সুযোগ বুঝে একসময় এসে দোলনা থেকে ছেলেটিকে মুখে নিয়ে দে ছুট। ঘুমিয়েছিল বলে খোকার মুখ থেকে রা-টিও বেরুল না। গায়রিঙ-এর নীচে থেকে শূয়রগুলো শুধু একবার 'ঘ্যোঁৎ-ঘ্যোঁৎ' আওয়াজ করে উঠল। ব্যস, তারপরই সব নীরব। ওদিকে বাঁশি নিয়ে মশগুল কচাকও বিন্দু বিসর্গ জানতে পারল না।

সূর্য তখনও ডোবেনি। ছাম্পারী খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। এসেই দোলনার পাশে। 'কোথায় — কোথায় আমার জুমের লাল ফলটি' বলে ছাম্পারী ডুকরে উঠল। কিন্তু খুব দেরী হয়ে গেছে। সেই কখনইতো সব শেষ হয়ে গেছে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে স্বামীকে খুব করে বকতে লাগল ছাম্পারী। মনে ব্যথা পেয়ে কেউ বকুনি দিলে তা না লেগে যায় না। ছাম্পারীর কথাও ঠিক লেগেছিল। ছাম্পারী স্বামীকে বলতে লাগল —"আর জীবনে তুমি পাখি হয়ে জন্মাবে। তোমার ঠোঁট দু'টো বাঁশির মতই লম্বা হবে। গলার স্বরও হবে খুব কর্কশ — শুনলে যেন কানে তালা লাগে। আরও বলছি, তোমার ছেলেমেয়েরা বড় না হওয়া অব্দি ওদের বুকে নিয়েই তোমার স্ত্রী বসে থাকবে। ছেলে হয়েও তুমি আলসের একশেষ। তাই আসছে জীবনে ছেলেপিলেদের নিয়ে বসে থাকা স্ত্রীকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাবার এনে খাওয়াবে। এভাবে দিনভর খেটে তুমি ক্লান্ত হবে। তোমাকে সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।' এতটুকু বলে ছাম্পারী ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গভীর বনের দিকে — আর ফিরে এল না।

সেদিন থেকে ধনেশ পাখির বাচ্চা হলে মা পাখিটি তার ছেলেপিলেদের আগলে গাছের বড় গর্তে বসে থাকে সারাদিন। পুরুষ পাখিটির নাওয়া নেই, খাওয়া নেই — সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে ওদের খাবার যোগাড় করে ক্লান্ত হতে থাকে। ❑

স্বর্গের ফুল রাস্না

চৈত্র মাস শেষ হতে চলল। বৈশাখ আসছে। দুদিন পরেই হবে 'গরিয়া' পূজা। পূজার সময় কয়েকদিন ধরে ঘরে ঘরে চলবে হৈ হুল্লোর, পান ভোজনের ছড়াছড়ি। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি চলছে।

এমনি দিনে এক যুবক শ্বশুর বাড়ীতে জামাই খাটার মেয়াদ শেষ হলে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। এবারকার 'সেনা'য় (গরিয়া উৎসবের সময়কে বলা হয় 'সেনা') স্ত্রীকে নিয়ে নিজের গাঁয়ে থাকবে, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনন্দে গা ভাসাবে। তাই মনে আনন্দের শেষ নেই।

খেয়ে দেয়ে রওয়ানা হতে হতে খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল। তবু আশা, সূয্যি ডোবার আগেই গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারবে! দু'জনেই খুব পা চালিয়ে হাঁটছে।

বনের মধ্য দিয়ে পথ। লোকজন নেই কোথাও। বেলা যতই গড়িয়ে যাচ্ছে বৈশাখী হাওয়ার বেগও ততই বেড়ে যাচ্ছে। দখিনা বাতাস মন উদাস করে। আচমকা বাতাসে ভেসে এল নাম না জানা কি একটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

"বাঃ- কী চমৎকার! এমন সুগন্ধ কি ফুলের গো?" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে স্বামীকে।

স্বামী —"ও ফুলের নাম" খেরেংবার বুবার "(রাস্না)"

স্ত্রী —"কি নাম বললে, খেরেংবার? এ নামতো কখনও শুনিনি। এমন মিষ্টি গন্ধও কখনও পাইনি। আমাকে এক গোছা পেরে দাও না গো, পরতে ভারী শখ হচ্ছে।"

স্বামী — "কি সর্বনেশে কথা বলছ তুমি! ও ফুল কি মানুষ পরতে পারে?"

স্ত্রী বলল —"এমন মিঠে গন্ধ ফুল কেউ পরে না — বল কি?"

স্বামী — "সত্যি বলছি, কেউ পরে না। শুনেছি ও ফুল স্বর্গের ফুল। দেবতাদের জন্যই শুধু ও-ফুল ফুটে থাকে। মানুষে পরলে খুব অনিষ্ট হল।"

স্ত্রী আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে —"স্বর্গের ফুল পৃথিবীতে এল কি করে?"

স্বামী — "কোন এক অপসরা নাকি এনেছিল। শাপ ভ্রষ্টা হয়ে পৃথিবীতে আসার সময় দেবী তার প্রিয় ফুলের চারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। স্বর্গের ফুল পৃথিবীর জলবায়ু সইতে পারবে না, তাই ওকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল দেবী। চেয়ে দেখ, ওটাই খেরেংবার ফুল। মাটির সাথে ওর যোগযোগ নেই। বেঁচে আছে অন্য একটা গাছে শিকড় আঁকড়িয়ে - সে গাছের গা থেকে রস শুষে নিয়ে।"

স্ত্রী — "আহা, দেখ-দেখ, ফুলগুলো দেখতেও কী সুন্দর! আচ্ছা, ও ফুল পরলে কি হয় বল না?"

স্বামী বলল — আমাদের "কামিতে (পাড়ায়) একজন দিয়ারী (ধ্যানকারী) আছেন। তিনি বলেন, ও ফুল পরলে 'হুলক' (উল্লুক) হয়ে যায়।"

কথাটা স্ত্রীর তেমন বিশ্বাস হল না। কিছু না বলে শুধু সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল সে।

এমন মিঠে গন্ধ ফুল পরতে না পেরে স্ত্রীর মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। তাই যুবক তার স্ত্রীকে বলল "ফুল না পেয়ে খুব দুঃখ হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা, দুঃখ করো না। আমি এক্ষুণি পেরে দিচ্ছি। কিন্তু দেখো, ফুল হাতে পেয়েই খোঁপায় গুঁজে বসবে না যেন। তা হলে আমি হুলক হয়ে যাব। দিয়ারীর মুখেই শুনেছি, দেবতার ফুল দেবতার নামে উৎসর্গ করে পরলে নাকি ক্ষতি হয় না। বাড়ীতে গিয়ে দিয়ারীর পরামর্শমত যা করবার করা যাবে। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি গাছে উঠছি। এই বলে তরতর করে গাছে উঠে কয়েক গোছা ফুল হাতে নিয়ে যুবক স্ত্রীকে বলল 'এই নাও, হাত পেতে ধর। ফুলগুলো ফেলছি।"

স্ত্রী হাত পেতে ফুলগুলো নিলে। এমন সুন্দর এমন মিষ্টি ফুল! স্ত্রী আর লোভ সামলাতে পারল না। সাথে সাথে এক গোছা ফুল খোঁপায় গুঁজে দিল! আর ওদিকে সাথে সাথেই তার স্বামীর হাত পা আটকে যেতে লাগল গাছের ডালে। গাছ থেকেই স্বামী ভয় পেয়ে বলে উঠল —'একি, আমার শরীরটা বদলে যাচ্ছে কেন! তুমি কি ফুলগুলো পরেছ?"

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী ভয় পেয়ে উপর দিকে তাকাল। সত্যি সত্যিই স্বামী তার বদলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফুলের থোকাটি খোঁপা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। সর্বনাশ যা হবার সে তো কখনই হয়ে গেছে। স্বামী বেচারা আর আগের মত হল না। তখন সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল —"হায়, কেন আমি ফুলগুলো পরতে গেলাম। লোকটি হুলক হয়ে যাচ্ছে। কি করব এখন — কি করে ওকে আবার মানুষ করে তুলব? ওকে এখানে রেখে আমি কোন মুখে গাঁয়ে ফিরে যাই। আমি কি নিয়ে বাঁচব।

গাছে উঠে সে স্বামীকে নামিয়ে আনতে চাইল। একে মেয়েমানুষ, তার উপর গাছটাও খুব উঁচু। কিছুতেই সেই বিরাট গাছটায় উঠতে পারল না। নিরুপায় হয়ে শোকে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল। চীৎকার দিয়ে সে বলতে লাগল, "ওগো, তুমিতো পুরুষ মানুষ। অনেক কিছু দেখেছ, জেনেছ। একবারটি বল না, কি করলে তুমি আবার মানুষের চেহারা ফিরে পাবে?"

স্বামী বেচারা এতক্ষণে প্রায় হুলক হয়ে গেছে। কথাগুলোও জড়িয়ে আসছে। অস্পষ্ট ভাষাতেই সে হাত পা নেড়ে বলতে লাগল, "আমি আর মানুষের চেহারা ফিরে পাব না। তোমাকে নিয়ে ঘর করব বলে মনে কত সাধ ছিল। কপাল মন্দ বলে তা আর হল না। এখন তুমি এক কাজ কর। তুমি আর এখানে থেকো না। অন্ধকার হয়ে আসছে। একটু পা চালিয়ে বাড়ীর দিকে হেঁটে যাও। তাহলে সন্ধ্যার সাথে সাথেই বাড়ীতে পৌঁছতে পারবে। আমাদের 'কামি'ও (পাড়া) এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ওই পায়ে চলা পথটি ধরে এগিয়ে গেলে পথ হারাবে না। মা বাবাকে আমার কথা বুঝিয়ে বলবে — তাদের সান্ত্বনা দিও। তুমি যাও। এ জীবনে না হলেও আরেক জীবনে তোমার সাথে মিলিত হব। এখন থেকে আমাকে 'হুলক' হয়েই থাকতে হবে।

নীচে থেকে স্বামীর কথা শুনছে আর ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে স্ত্রীর। সে চীৎকার করে গাছের গোড়াতে মাথা কুটতে লাগল আর বলতে লাগল —'ওগো অমন কথা বলো না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমার জন্যই তো তুমি 'হুলক' হলে। কেন আমি সর্বনাশা ফুল পরতে গেলাম। তোমাকে না নিয়ে আমি কি করে কামিতে ফিরে যাই? না, —না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমি এক্ষুণি, এ গাছের গোড়াতেই মাথা কুটে মরব। ঘটলও তাই। গাছের সাথে মাথা ঠুকতে ঠুকতে একসময় স্ত্রীর দেহটা অসাড় হয়ে পড়ল। স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে সেখানেই একসময় মরে পড়ে রইল।

ওদিকে উপর থেকে স্বামী বেচারা সবই দেখছিল। তীব্র যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারছিল না। এতক্ষণে পুরোপুরি হুলক হয়ে গেছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল গোঙানির শব্দ —"হু-হু,' হু-হু, হুলক হুতে, হুলক হুতে।"

স্ত্রীর অতৃপ্ত হৃদয় মন চেয়েছিল স্বামী সান্নিধ্য। তাই আবার সে জন্ম নিল 'মুফুক' (গোধিকা) হয়ে সে বনেই। তার দুরাকাঙ্খার শাস্তিস্বরূপ সে 'হুলক' হয়ে জন্মাল না।

আজও বৈশাখ মাস এলে 'খেরেংবার' (রাম্না, অর্কিড) ফুল ফুটলে হুলক তার গত জীবনের কথা মনে করে 'হুলক-হুতে, হুলক-হুতে' বলে গোঙরিয়ে উঠে। আর তক্ষুণি মাটি থেকে মিলনাকাঙ্খী 'মুফুক' লেজ-চাপড়াতে থাকে।

নরনারীর এই অতৃপ্ত আকাঙ্খার কান্না বুঝি দেবতাদের মনেও দোলা দিয়েছিল। আর কোনদিন যাতে এ রকমটা না ঘটে তার জন্যই দেবতারা সেদিন থেকে খেরেংবার ফুলের গন্ধ নিজেদের গায়ে নিয়ে নিল। তাই আজ আমরা রাম্না ফুলের বুকে কোন গন্ধ খুঁজে পাই না। ❑

আমাকে মেনে চলে, ভয় করে। তুই কোথাকার এমন, আমার খাবার জল ঘুলিয়ে দেবার সাহস হল?" সজারু কিন্তু এতটুকুও ভয় পেল না। সেও যতটুকু সম্ভব রেগে গিয়ে বলল — "তোর সাহসের বলিহারি যাই।" আমি হলাম এ রাজ্যের রাজা। তোর জল খাবার জায়গাটা — তাও আমার রাজ্যের ভেতরেই। আর তুই কিনা চোখ রাঙিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এলি? যা —যা, শীগ্‌গীর এখানে থেকে দূর হয়ে যা বলছি। নাহলে এক্ষুণি মাটিতে পুঁতে ফেলব দেখিস্। এভাবে বললে কি আর মাথা ঠিক থাকতে পারে কারো! হাতী শূর তুলে, দাঁত বের করে বিরাট শরীরটাকে দু'একবার নাড়া দিয়ে নিজের শক্তি দেখাতে চাইল। গলার আওয়াজটাও মেঘের গর্জনের মত করে উঠল, "তুইতো দেখছি খুব বড়াই করছিস্। তোর সবটা শরীর আমার একখানা পায়ের সমানও যদি হয়তো বলি।" সজারু বলল — 'আরে ধ্যাৎ, তুই কি আমাকে এতটুকুন ভাবছিস নাকি? মনে রাখিস, তোর মত তিন চারটে জানোয়ার আমার সকাল বেলার জলখাবার খেতেই লেগে যায়।"

হাতী ভড়কে গেল। সত্যিই তো এ আবার কেমন লোক! হাতী আগে কখনও সজারু দেখেনি, আজই প্রথম। তাছাড়া আজকে যেটুকু দেখল, তাও পা থেকে মাথা অব্দি সবটা দেখতে পায়নি। গর্তে ঢোকার সময় লেজের দিকে খানিকটা, পরে মুখের খানিকটা শুধু দেখতে পেয়েছিল। কে জানে বাবা, সত্যি সত্যিই খুব বড় কিছু একটা কিনা কে জানে। হলেওবা হতে পারে। কিন্তু তা বলে ভয় পেলে তো চলবে না। ভয় পেলেও শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়েই চীৎকার করে উঠল সে- "তা হলে বেরিয়ে আয় একবার, তুই কত বড় মানুষ খেকো পরখ করে দেখি।' সজারু গর্ত থেকে না বেরিয়েই শরীর থেকে একটা কাঁটা তুলে হাতীর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল — " তা আমার শরীরের এ লোমখানা মেপে দেখ দিকিনি, তা হলেই আমাকে বুঝতে পারবি।" হাতী ওটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরখ করে দেখতে লাগল। সত্যিই তো, এতো দেখছি একখানা আস্ত লোহার কাঁটা। মানুষের লোম কি এত শক্ত! জীবনে অনেক মানুষের দেখা পেয়েছি, কিন্তু এমন সূঁচের মত লোমওয়ালা একজন মানুষও দেখিনি। ওর সাথে কুস্তিতে পেরে উঠব না বলেই মনে হচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠল হাতী। লেজ আকাশে তুলে পারি কি মরি, যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে, বাঁচল। শরীর বড় হলে কি হবে, হাতীও কখনও কখনও বুদ্ধিতে ওর চেয়ে ছোট কারো কাছে হেরে যেতে পারে। ❑

একটি মাছির গল্প

কাজের মরশুম। গাঁয়ের যুবক-যুবতী আর বিবাহিত মেয়েরাও কাজ করছে দূর পাহাড়ের এক জুমে। ওদের মাঝে একজন যুবক একটি মাছি ধরে বলছে — দেখ, দেখ, আমি তাবড় একটা মাছি ধরেছি। বাঃ কি সুন্দর পোঁ পোঁ করে ডাকছে।" কাজে মনযোগ নেই দেখে ওর বৌদি ওকে বলছে — কাজ না করে মাছিই ধরছ দেখছি; তা' দিয়ে বিয়ে করতে পারবে কি?" যুবক বলল — "পারব না কেন? আমার ভাগ্যে যাকে পাবার তাকে পাবই; কোথায় যাবে সে?" বৌদি বলল —"বেশ, তাহলে এ মাছিটা দিয়েই বিয়ে কর দেখিনি, কাজ করার দরকার নেই। যুবক বলল —"সত্যি বললে বৌদি?" — "হাঁ-হাঁ সত্যিই। তুমি কিন্তু একটা মাছি দিয়েই বিয়ে করতে পারবে না বলছি" — বৌদি বলল। অবিবাহিত যুবতীরাও বলল —"এতটুকুন সোজা হলে সত্যিই লেগে পড় দাদা। কী লজ্জার কথা! তোমার বদলে আমাদেরও যে লজ্জা হচ্ছে।" যুবক বলল — "সত্যি বলছি, আমি এ মাছিটা দিয়ে বিয়ে করতে না পারিতো, আর ঘরে ফিরছি না। যুবতীরা বলে উঠল — "সত্যি সত্যিই বললে, নাকি?" যুবক "হাঁ-হাঁ, সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে না পারলে ঘরে আর ফিরছি না। এ তোমরা ঠিক দেখে নিও।"

যে কথা সে কাজ। যুবক মাছি হাতে নিয়েই কাজ ছেড়ে চলে এল। ঘরে এসে কাপড় চোপড় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দূর গাঁয়ের পথে — মেয়ে খুঁজতে। মাছিটি কিন্তু হাতের মুঠোতেই রয়ে গেল। তখনকার দিনের গাঁ-গুলো ছিল খুব দূরে দূরে। এক গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ে যেতে হলে বেশ সময় লাগত। গাঁ-গুলোতে লোকও ছিল খুব কম। যা হোক, যুবক চলতে চলতে কোন এক গাঁয়ে এসে পৌঁছল। বেলা যায় যায় —সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। রাতটা এখানেই কোন এক বাড়ীতে কাটিয়ে যাবে বলে ভাবল। তাই কোন এক গেরস্তর ঘরে উঠে সে বলল —"জ্যাঠা, জ্যাঠা, আজ আমি এখানেই ঘুমোব। বেলা গেছে। আজ আর চলতে পারব না।" গেরস্ত উত্তরে বলল —"ঘুমুতে চাওতো ঘুমোও। তাতে আর কি আছে?" যুবক বলল — "তাহলে জ্যাঠা, আমার এ মাছিটা কোথায় রাখি?" গেরস্ত বলে —"ওই যে ওখানে হাঁড়ি আছে, ওটাতে না হয় পুরে রাখ।" পরদিন গেরস্তের মেয়ে খুব ভোরে রান্নার জন্য হাঁড়ির "সরক" (মাটির তৈরী ঢাকনা) খুলতেই মাছিটি ভোঁ করে উড়ে গেল। যুবক যাওয়ার সময় মাছিটি চেয়ে পেল না। যুবক গেরস্তকে জিজ্ঞাসা করল — "আমার মাছিটা কোথায় গেল জ্যাঠা?" গেরস্ততো অবাক! গেরস্ত বলল —"তাই তো! তোমার ছোট বোন ভাত রাঁধার সময় সরক খুলতেই উড়ে গেছে হয়তো।" যুবক বলে — "এখন কি করি বলতো জ্যাঠা?" — "কি আর করবে? মাছির বদলে একটা "চুউান" (মদ বানানোর জন্য যে পিঠা ব্যবহার করা হয়) না হয় নিয়ে যাও।" যুবক মাছির বদলে একটা 'চুউান' নিয়েই চলতে লাগল। যেতে যেতে সন্ধ্যা নাগাদ সে আর এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল। রাতটা এ গাঁয়েরই কোন এক ঘরে কাটিয়ে দেবে ভাবল। খুঁজে পেতে এক গেরস্তের ঘরে উঠে যুবক বলল — "জ্যাঠা, জ্যাঠা, রাতটা আমি তোমার ঘরেই থাকব। রাত বিরেতে আর এগুতে পারব না। তা জ্যাঠা, আমার এ চুউানটা কোথায় রাখবো বলতো!" — "রেখে দাও না ওই পিঠের চালনিটাতে' — বলল গেরস্ত। সেও সেখানেই রাখল। সেদিন রাতে যা ঘটল, গেরস্তের মেয়ে পিঠে গুড়ো করছে মদ তৈরী করতে। পরদিন — যাওয়ার সময় যুবক তার চুউান ফিরে চাইল। যুবক বলছে "জ্যাঠা, জ্যাঠা, আমার চুউানটা?" গেরস্ত এ্যা ... তোমার ছোট বোন হয়ত চুউান পিষবার সময় পিষে ফেলেছে। তা চুউানের বদলে একটা মোরগ নিয়ে যাও বাবা। কি ভুলই না হয়ে গেল। যুবক তাতেই রাজী হল। যুবক মোরগ নিয়ে আবার পথ চলতে লাগল। চলেছে তো চলেছে — চলার বিরাম নেই। এমনি চলতে চলতে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ যুবক গিয়ে উঠল অন্য এক গাঁয়ে। সেখানেও সে এক বাড়ীতে উঠে বলল —"জ্যাঠা, আজ আমাকে এখানে ঘুমোতে হচ্ছে। রাত হয়ে আসছে, আজ আর চলতে পারব না।" গেরস্ত —"আচ্ছা, আচ্ছা তা থাকবে বৈকি! রাত বিরেতে আর যাবেই বা কোথায়?" যুবক —"তাহলে জ্যাঠা, আমার এই মোরগটা কোথায় রাখি?" গেরস্ত —"ওই যে মোরগ রাখার ঘর দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই পুরে রাখ!" যুবকও মুরগটি ওখানেই পুরে রাখল। রাত্তিরে বাড়ীর মালিক একটা মোরগ কেটে অতিথিকে খাওয়াল, নিজেরাও খেল। সে মুরগটি ছিল যুবকের। পরদিন

যে কথা সে কাজ। যুবক মাছি হাতে নিয়েই কাজ ছেড়ে চলে এল। ঘরে এসে কাপড় চোপড় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দূর গাঁয়ের পথে — মেয়ে খুঁজতে। মাছিটি কিন্তু হাতের মুঠোতেই রয়ে গেল। তখনকার দিনের গাঁ-গুলো ছিল খুব দূরে দূরে। এক গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ে যেতে হলে বেশ সময় লাগত। গাঁ-গুলোতে লোকও ছিল খুব কম। যা হোক, যুবক চলতে চলতে কোন এক গাঁয়ে এসে পৌঁছল। বেলা যায় যায় —সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। রাতটা এখানেই কোন এক বাড়ীতে কাটিয়ে যাবে বলে ভাবল। তাই কোন এক গেরস্তর ঘরে উঠে সে বলল —"জ্যাঠা, জ্যাঠা, আজ আমি এখানেই ঘুমোব। বেলা গেছে। আজ আর চলতে পারব না।" গেরস্ত উত্তরে বলল —"ঘুমুতে চাওতো ঘুমোও। তাতে আর কি আছে?" যুবক বলল — "তাহলে জ্যাঠা, আমার এ মাছিটা কোথায় রাখি?" গেরস্ত বলে —"ওই যে ওখানে হাঁড়ি আছে, ওটাতে না হয় পুরে রাখ।" পরদিন গেরস্তের মেয়ে খুব ভোরে রান্নার জন্য হাঁড়ির "সরক" (মাটির তৈরী ঢাকনা) খুলতেই মাছিটি ভোঁ করে উড়ে গেল। যুবক যাওয়ার সময় মাছিটি চেয়ে পেল না। যুবক গেরস্তকে জিজ্ঞাসা করল — "আমার মাছিটা কোথায় গেল জ্যাঠা?" গেরস্ততো অবাক! গেরস্ত বলল —"তাই তো! তোমার ছোট বোন ভাত রাঁধার সময় সরক খুলতেই উড়ে গেছে হয়তো।" যুবক বলে — "এখন কি করি বলতো জ্যাঠা?" — "কি আর করবে? মাছির বদলে একটা "চুউান" (মদ বানানোর জন্য যে পিঠা ব্যবহার করা হয়) না হয় নিয়ে যাও।" যুবক মাছির বদলে একটা 'চুউান' নিয়েই চলতে লাগল। যেতে যেতে সন্ধ্যা নাগাদ সে আর এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল। রাতটা এ গাঁয়েরই কোন এক ঘরে কাটিয়ে দেবে ভাবল। খুঁজে পেতে এক গেরস্তের ঘরে উঠে যুবক বলল — "জ্যাঠা, জ্যাঠা, রাতটা আমি তোমার ঘরেই থাকব। রাত বিরেতে আর এগুতে পারব না। তা জ্যাঠা, আমার এ চুউানটা কোথায় রাখবো বলতো!" — "রেখে দাও না ওই পিঠের চালনিটাতে' — বলল গেরস্ত। সেও সেখানেই রাখল। সেদিন রাতে যা ঘটল, গেরস্তের মেয়ে পিঠে গুড়ো করছে মদ তৈরী করতে। পরদিন — যাওয়ার সময় যুবক তার চুউান ফিরে চাইল। যুবক বলছে "জ্যাঠা, জ্যাঠা, আমার চুউানটা?" গেরস্ত এ্যা ... তোমার ছোট বোন হয়ত চুউান পিষবার সময় পিষে ফেলেছে। তা চুউানের বদলে একটা মোরগ নিয়ে যাও বাবা। কি ভুলই না হয়ে গেল। যুবক তাতেই রাজী হল। যুবক মোরগ নিয়ে আবার পথ চলতে লাগল। চলেছে তো চলেছে — চলার বিরাম নেই। এমনি চলতে চলতে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ যুবক গিয়ে উঠল অন্য এক গাঁয়ে। সেখানেও সে এক বাড়ীতে উঠে বলল —"জ্যাঠা, আজ আমাকে এখানে ঘুমোতে হচ্ছে। রাত হয়ে আসছে, আজ আর চলতে পারব না।" গেরস্ত —"আচ্ছা, আচ্ছা তা থাকবে বৈকি! রাত বিরেতে আর যাবেই বা কোথায়?" যুবক —"তাহলে জ্যাঠা, আমার এই মোরগটা কোথায় রাখি?" গেরস্ত —"ওই যে মোরগ রাখার ঘর দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই পুরে রাখ!" যুবকও মুরগটি ওখানেই পুরে রাখল। রাত্তিরে বাড়ীর মালিক একটা মোরগ কেটে অতিথিকে খাওয়াল, নিজেরাও খেল। সে মুরগটি ছিল যুবকের। পরদিন

যুবকের যাওয়ার সময় সে মোরগটি চাইল। গেরস্ত তো খুঁজে পেতে মাথায় হাত দিয়ে বসল। "হায়—হায়, তা হলে তো গেল রাতে তোমার মোরগটাই কাটা গেছে।" যুবকও অসহায়ভাবে বলল—"তাহলে এখন উপায়?" গেরস্ত— "তা — কি আর করি বল? তুমি না হয় মোরগের বদলে একটা ছাগলই নিয়ে যাও।" যুবক তাতেই রাজী হল। যুবক ছাগল নিয়ে চলতে লাগল। সূর্য্যি ডোবার সাথে সাথে এক গাঁয়ে উঠে সে গাঁয়ের গেরস্তকে বলল— "জ্যাঠা, জ্যাঠা আজ রাতটা আমি তোমার বাড়ীতেই কাটিয়ে যাব ভাবছি। আজ আর চলতে পারব না।" —"তা থেকে যাও না কেন। রাতও হয়েছে। রাত বিরেতে যাবে কোথায়? গেরস্ত তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। যুবক ঘরে যেতে যেতে বলল— "তাহলে জ্যাঠা আমার ছাগলটাকে কোথায় রাখি?" গেরস্ত "তা রেখে দাও না বাবু, ওই যে ছাগল রাখার ঘর রয়েছে, ওখানেই না হয় ঢুকিয়ে রেখে দাও। সেও সেখানেই ঢুকিয়ে রাখল। সেদিন রাত্তিরে গেরস্ত ছাগল কেটে অতিথিকে ভোজ দিল। এমনি কাণ্ড, যে ছাগলটা কেটেছিল, তা ছিল যুবকেরই। পরদিন ভোরবেলা যাওয়ার সময় যুবক তার ছাগলটি নিয়ে যেতে চাইল। গেরস্ততো যুবকের ছাগল নেই দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। সে দুঃখের সঙ্গে বলে উঠল— "হায়, তাহলে তো গতকাল রাত্তিরে ভুলে তোমার ছাগলটাই কাটা গেছে। কি আর করা যায়! ছাগলের বদলে তুমি না হয় একটা গরু নিয়ে যাও।"

যুবক গরু নিয়ে পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে বেলা শেষে আর এক গাঁয়ে গিয়ে উঠল। এভাবে দিন যায়, রাত আসে। এমনি দিনে যুবক এক বাড়ীতে উঠে গেরস্তকে বলছে— "জ্যাঠা, আজ আমি এখানেই থাকব। রাত হয়েছে আর চলতে পারব না।" গেরস্ত বলছে— "তা থেকে যাও না বাবু। রাত হয়ে এল, এখন আর পথ চলতে পারবে না।" যুবক— "তা হলে জ্যাঠা আমার এ গাইটা কোথায় রাখি? —"ওই যে গোয়াল ঘর, ওখানেই রাখ না কেন—" এই বলে গেরস্ত তার গোয়াল ঘরটি দেখিয়ে দিলে। যুবকও গেরস্তের গুরুগুলোর সঙ্গেই তার গরুটা গোয়ালে ঢুকিয়ে রাখল। পরদিন ভোরবেলা গেরস্ত আর আর দিনের মত গোয়ালের দরজা খুলে দিতেই গরুগলো যে যার মত পাহাড়ে চড়তে গেল। যুবক যাওয়ার সময় গরুটা চাইল। কিন্তু গরু আর পাবে কোথায়? যুবক তাই গেরস্তকে জিজ্ঞাসা করল — "জ্যাঠা, জ্যাঠা, আমার গরুটা কোথায়?" গেরস্ত বলে— "হাঁ.....য়, আমিতো তোমার গরুটাও ছেড়ে দিয়েছি।" খুঁজে দেখল অনেক। কিন্তু কোথাও গরুটা পাওয়া গেল না। যুবক বললে— "তাহলে এখন কি করব জ্যাঠা?" কোথা থেকে গরু এনেছে, কেন এনেছে ইত্যাদি হরেক রকম কথা জিজ্ঞাসা করল গেরস্ত। যুবকও বাধ্য হয়ে সব কথা খুলে বলল— একটা মাছি থেকে বিয়ে করতে চাওয়ার আদিঅন্ত ঘটনা।

গেরস্তের একটি যুবতী মেয়ে ছিল। তাই গেরস্ত যুবকের নিকট প্রস্তাব দিলে— "তা হলে এখানেই জামাই হয়ে থেকে যাওনা কেন।" যুবক আর কি করবে! সেও তাতেই রাজী হল। সে বছর সে সেখানেই ঘর সংসার বেঁধে রইল। বছর ঘুরে আসতেই যুবকের ঘরে একটি ছেলেও হল। সেই যে কবে ঘর ছেড়ে এসেছে— আর যায়নি। এবার সে তার

নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। অনেকদিন পর যুবক ছেলে আর বৌকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। ঘরে ফিরে ছেলে কোলে নিয়ে আদর করছে আর গাইছে—

"আরে মাছি মাছি —— মাছি ——,
মাছির বদল চুড়ান দিল, এক গাঁয়ের এক পিসী।
পিঠের বদল মোরগ পেলাম, কেমন মজা ভাই;
মোরগ খেলাম, ছাগল পেলাম, কোন কষ্ট নাই।
ছাগল গেল, গাভী এল, ভিন গাঁয়েতে যাই।
গাভী খুইয়ে বৌ পেলাম, যাহা আমি চাই।
ঘর সংসার বেঁধে সেথায় একটি বছর গেলে—
কে দেখবে, দেখতে এস, কোলে পেলাম ছেলে।।"

—এমনি গান গাইছে আর আদর করছে শুনে গাঁয়ের সেই যুবতী মেয়েরা সবাই দেখতে এল— সত্যি কি মিথ্যা পরখ করে নিতে।

আগেকার দিনে পাহাড়ে এমনি করেও বিয়ে করতে পারত। ❑

বলল— "মা, আজ আমি রাজার লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমাদের জুমের সীমা কদ্দুর অব্দি জিজ্ঞাসা করতেই "এটা আমাদের, ওটা দিদিদের। ওই যে জুমের শেষ সীমা দেখা যাচ্ছে 'বলে দিয়েছি।'

তার মাও ছিল কালা—বধির। মেয়ের কথা কিছু বুঝতে পারল না। অন্য কি কথা যেন শুনল। ওরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছে, এ কথাই যেন মেয়ে এসে বলল। অন্যের জিনিষ-পত্তর ধরল না, ছুঁল না; তা কিনা ওদের বলা হচ্ছে চোর! আচ্ছা —বোস, ওকে না বললে আর হচ্ছে না। বলেই সে স্বামীর কাছে নালিশ করতে চলল। দাওয়ায় বসে বুড়ো স্বামী বৌ এর জন্য খুব মিহি একটা 'লাঙ্গা' (খাচি) বানাচ্ছিল। বৌ ওখানে গিয়ে বলল, —ওগো শুনছ? আমরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছি। মাতিং কোত্থেকে শুনে এসে আমাকে বলল।"

স্বামী বেচারাও ছিল বধির — কানে শুনতে পেত না। স্ত্রীর কথা না শুনে সে কি বুঝল সেই জানে। সে যেন শুনল তার স্ত্রী এসে বলছে অন্য মেয়েলোকের সঙ্গে তার ভাব আছে। তাকে দেবার জন্যই নাওয়া নেই, খাওয়া নেই রাতদিন দাওয়ায় বসে বসে এত সুন্দর করে লাঙ্গা বানাচ্ছে। যেই এই কথা মনে আসা অমনি বুড়ো রাগে ফুসতে লাগল। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! আমি ওকে কত স্নেহই না করে থাকি। ওকে দেব বলেই তো সাধ করে ফুলতোলা লাঙ্গাটা বানাচ্ছিলাম। আর ওই-ই কিনা বলে আমার অন্য মেয়েলোকের সঙ্গে ভাব আছে। "আচ্ছা, এবার তাহলে তুমি লাঙ্গা বয়ে বেড়াও দিখিনি' এই বলে দায়ের এক কোপেই লাঙ্গাটা দু'টুকরো করে ফেলল।

এ ওর কথা বুঝতে পারছে না, ও এর কথা বুঝতে পারছে না। ঘরের সবাই যে যার মত বকে যাচ্ছে, ঝগড়া করছে। কে কার কথা শুনবে! ওদের ঝগড়া শুনে পড়শীরা এসে ওদের দাওয়ায় জড় হল। সত্যিই তো, আজ কি নিয়ে ওদের এত চেঁচামেচি! ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে "তোমরা কি নিয়ে এত ঝগড়া করছ", জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি বলল, "শোন বলছি, আজ জুমে গেলে রাজার লোকেরা এসে আমাকে জুমের সীমা কদ্দুর অব্দি জিজ্ঞাসা করতেই' এটা আমাদের, ওটা দিদিদের। ওই যে ওখানে জুমের সীমানা রয়েছে' বলেছি। তাই-ই মাকে দৌড়ে বলতে এলাম। মা কি শুনেছে, মা-ই জানে। বাবাকে কি বলে যেন শোনাল, কি নিয়ে ওরা ঝগড়া করছে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এবার পড়শীরা মাকে জিজ্ঞাসা করল,— 'আচ্ছা মাতিং এসে তোমাকে কি বলেছে, তুমি কি শুনেছ বল দিকিনি।" "আমরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছি," মাতিং এসে বলল। ঘরের মানুষকে তাই শোনাতে গিয়েছিলাম। অ কপাল—সে কি বুঝল সেই জানে। তা এমন কিই বা বলেছি, মিনসে কিনা লাঙ্গাটা দা দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলল।

বলল— "মা, আজ আমি রাজার লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমাদের জুমের সীমা কদ্দুর অব্দি জিজ্ঞাসা করতেই "এটা আমাদের, ওটা দিদিদের। ওই যে জুমের শেষ সীমা দেখা যাচ্ছে 'বলে দিয়েছি।'

তার মাও ছিল কালা—বধির। মেয়ের কথা কিছু বুঝতে পারল না। অন্য কি কথা যেন শুনল। ওরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছে, এ কথাই যেন মেয়ে এসে বলল। অন্যের জিনিষ-পত্তর ধরল না, ছুঁল না; তা কিনা ওদের বলা হচ্ছে চোর! আচ্ছা —বোস, ওকে না বললে আর হচ্ছে না। বলেই সে স্বামীর কাছে নালিশ করতে চলল। দাওয়ায় বসে বুড়ো স্বামী বৌ এর জন্য খুব মিহি একটা 'লাঙ্গা' (খাচি) বানাচ্ছিল। বৌ ওখানে গিয়ে বলল, —ওগো শুনছ? আমরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছি। মাতিং কোত্থেকে শুনে এসে আমাকে বলল।"

স্বামী বেচারাও ছিল বধির — কানে শুনতে পেত না। স্ত্রীর কথা না শুনে সে কি বুঝল সেই জানে। সে যেন শুনল তার স্ত্রী এসে বলছে অন্য মেয়েলোকের সঙ্গে তার ভাব আছে। তাকে দেবার জন্যই নাওয়া নেই, খাওয়া নেই রাতদিন দাওয়ায় বসে বসে এত সুন্দর করে লাঙ্গা বানাচ্ছে। যেই এই কথা মনে আসা অমনি বুড়ো রাগে ফুসতে লাগল। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! আমি ওকে কত স্নেহই না করে থাকি। ওকে দেব বলেই তো সাধ করে ফুলতোলা লাঙ্গাটা বানাচ্ছিলাম। আর ওই-ই কিনা বলে আমার অন্য মেয়েলোকের সঙ্গে ভাব আছে। "আচ্ছা, এবার তাহলে তুমি লাঙ্গা বয়ে বেড়াও দিখিনি' এই বলে দায়ের এক কোপেই লাঙ্গাটা দু'টুকরো করে ফেলল।

এ ওর কথা বুঝতে পারছে না, ও এর কথা বুঝতে পারছে না। ঘরের সবাই যে যার মত বকে যাচ্ছে, ঝগড়া করছে। কে কার কথা শুনবে! ওদের ঝগড়া শুনে পড়শীরা এসে ওদের দাওয়ায় জড় হল। সত্যিই তো, আজ কি নিয়ে ওদের এত চেঁচামেচি! ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে "তোমরা কি নিয়ে এত ঝগড়া করছ", জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি বলল, "শোন বলছি, আজ জুমে গেলে রাজার লোকেরা এসে আমাকে জুমের সীমা কদ্দুর অব্দি জিজ্ঞাসা করতেই' এটা আমাদের, ওটা দিদিদের। ওই যে ওখানে জুমের সীমানা রয়েছে' বলেছি। তাই-ই মাকে দৌড়ে বলতে এলাম। মা কি শুনেছে, মা-ই জানে। বাবাকে কি বলে যেন শোনাল, কি নিয়ে ওরা ঝগড়া করছে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এবার পড়শীরা মাকে জিজ্ঞাসা করল,— 'আচ্ছা মাতিং এসে তোমাকে কি বলেছে, তুমি কি শুনেছ বল দিকিনি।" "আমরা নাকি পড়শীর মুরগী চুরি করে খেয়েছি," মাতিং এসে বলল। ঘরের মানুষকে তাই শোনাতে গিয়েছিলাম। অ কপাল—সে কি বুঝল সেই জানে। তা এমন কিই বা বলেছি, মিনসে কিনা লাঙ্গাটা দা দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলল।

এবার পড়শীরা বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল— 'আচ্ছা বাবু, তুমি এত রেগে গেলে কেন বল দেখি। এতক্ষণে বুড়োর রাগ খানিকটা পড়েছে। বুড়ো বলল — দেখ দিকি, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, এতটুকু কষ্ট করে ওর জন্য একটা লাঙ্গাতে ফুল তুলছিলাম। ওই কিনা এসে বলে অন্য কারো সঙ্গে আমার ভাব রয়েছে; তাকে দেবার জন্যই আমি লাঙ্গা বানাচ্ছি। তোমরাই বল দিকিনি, এ সব কথা শুনে কেউ কি না রেগে থাকতে পারে! কেউ কারো কথা শুনতে পায়নি বলেই ঘোঁট পেকেছে; ঝগড়া হচ্ছে। পড়শীরা খুব একচোট হেসে মা-মেয়ে-বাবা তিনজনের ঝগড়া মিটিয়ে দিলে। এক ঘরের সবাই কানে শোনে না বলে কি কাণ্ডটা না হয়ে গেল। ❑

প্রতিজ্ঞা

কোন এক গেরস্তের ঘর। গেরস্ত বৌ এর ছেলে হবে। দশ-মাস। বৌ-টি টংঘরের দাওয়ায় বসে তাঁত বুনছিল। ঘরটা তত ভাল নয়। এদিকে ওদিকে ভাঙ্গা, ফুটো-ফাটা। গর্ভবতী, কাজকর্ম ততটা করতে পারে না। ঘরদোরও ততটা গুছিয়ে রাখতে পারেনি। সারা শরীরে যেন আলস্য লেগেই আছে। কোথাও বসলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।

টংঘরের নীচে আছে একটা গরু। ওরও বাচ্ছা হবে। পেট মাটিতে ফেলে শুয়ে আছে। নড়তে চড়তে একদম ইচ্ছা করে না। কাপড় বুনতে গিয়ে আচমকা গেরস্ত বৌ এর হাতের মাকুটা ফসকে গেল। পড়বি তো পড়, মেঝের ফুটো দিয়ে একেবারে টংঘরের নীচে। তাই মেয়েলোকটি গরুটিকে বলছে — "গাইমা, গাইমা, আমার মাকুটা একটু তুলে দে না।' গাইমা মাকুটা তুলে দিল। গেরস্ত বৌ আবার কাপড় বুনতে লাগল। কাপড় বুনতে বুনতে আবারও পড়ে গেল মাকুটা। এবারও গেরস্ত বৌ গাইমাকে মাকুটা তুলে দিতে বলল। বার

বার উঠতে বসতে গিয়ে গাইমা ভারী বিরক্ত হল। এবার কিন্তু গাইমা মাকুটা এমনিতে তুলে দিল না। সে গেরস্ত বৌকে বলল— "দেখ বৌ, তোমার ঘরেও হবে, আমার ঘরেও হবে। তোমার নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে; আমারও হচ্ছে। তুমি বার বার কি করে আমাকে ফরমাস করছ? তাই বলছি, শপথ করতো তুলে দি, এবার।" গেরস্ত বৌ বলল —"কি বলে শপথ করব? তা' করব বৈকি! বলে দে কি. বলে শপথ করব।" গাইমা বলল — "তোমার ছেলে আর আমার মেয়ে হলে দু'জনের বিয়ে হবে। আমার ছেলে হলে তোমার মেয়ে হলেও দু'জনের বিয়ে দিতে হবে। দু'জনেরই ছেলে হলে ওরা দু'জন বন্ধু হবে, দু'জনের মেয়ে হলে ওরা দু'জনে সই পাতবে।" বৌ বলল —"আচ্ছা, আচ্ছা তা হবে খ'ন। এখন মাকুটা তুলে দে দিকিনি।" গাইমা মাকুটা তুলে দিল।

একদিন দু'জনের ঘরেই হল। গেরস্ত বৌ-এর একটি মেয়ে আর গাইমার ঘরে হল একটি বেটা বাছুর। মেয়েটির বয়স বছর দু'য়েক হল। গরুটাও বড় হয়েছে। মেয়েটির খেলার সময়, খাওয়ার সময় গরুটা ওর সঙ্গেই থাকে। ঘুমানোর সময়ও গরুটা মেয়েটির পাশেই ঘুমায়। এভাবে দিন যায়। মেয়েটি এখন বড় হয়েছে। বুকে বিছা বেঁধেছে, ভালমন্দ সব কিছু বুঝতে শিখেছে। গরুটা কিন্তু এখনও সব সময় ওর সাথেই লেগে থাকে। জুমে কাজ করতে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে যাবে, ঘাটে জল আনতে গেলেও ওর পেছনে পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এসব দেখে শুনে পড়শীরা মেয়েটিকে 'গরু বৌ' বলে ডাকতে শুরু করল। এসব কথা শুনে মেয়েটি কাঁদে।

একদিন কেঁদে কেঁদে মেয়েটি — পড়শীরা কেন ওকে 'গরুবৌ' বলে ডাকে মাকে জিজ্ঞাসা করল। মেয়ের কান্না-কাটিতে মা তার পূর্ব শপথের কথা বলে শোনাল। সেদিন থেকে মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পড়শীরা তো তা হলে ঠিকই বলছে। দিন দিনই ও শুকিয়ে যেতে লাগল।

ঘরের পাশেই ছিল মস্ত আমলকী গাছ। গাছটা খানিকটা উঠেই দু'দিকে দু'টো ডাল ছড়িয়ে দিয়েছে। সইতে না পেরে একদিন মেয়েটি সে গাছের ডালে গলা আটকিয়ে ঝুলে মরল। গরুটাও মেয়ের দেখা দেখি ওই ডালের মাঝেই মাথা আটকিয়ে ঝুলে মরল। এক গাছের একই ডালে ওদের দু'জনের মরণ হল।

এক বছর পর — কোন এক রাজার ঘরে মেয়েটি আবার জন্ম নিল। গরুটাও সে রাজার বাড়ীতেই 'শ্বেত হস্তী' হয়ে জন্ম নিল। রাজকুমারীর সব সময়ের খেলার সাথী হল সাদা হাতীটি। হাতী হলে কি হবে — হাতীটির কিন্তু গত জীবনের সব কথা মনে ছিল। সাদা হাতী রাজকুমারীকে প্রায়ই পিঠে নিয়ে বেড়ায় — কথাবার্তা বলে, এদিক ওদিক ঘুরে। এভাবে দিন যায়। একদিন সাদা হাতী রাজকুমারীকে পিঠে বয়ে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এল না। কোন এক অজানা দেশে পালিয়ে গেল। সাদা হাতী কখন কোন পথে পালিয়ে গেল রাজ্যের লোকেরা কিছুই জানতে পারল না। রাজকুমারীকে হারিয়ে রাজবাড়ীতে কান্নার রোল

পড়ে গেল। রাজ্যময় শুরু হল খোঁজাখুঁজি। সিপাই বরকন্দাজেরা ছুটল চারদিকে। কিন্তু কেহ কোথাও সাদা হাতী আর রাজকুমারীর সন্ধান পেল না।

শেষ পর্যন্ত রাজা রাজ্যজুড়ে ঢোল পিটিয়ে দিলেন। কুমারীকে যে এনে দিতে পারবে তার সঙ্গে রাজা কুমারীর বিয়ে দেবেন আর দেবেন রাজ্যের অর্ধেকটা। দিন যেতে লাগল। কিন্তু কেউ সে ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে এল না।

অন্য এক রাজ্যের দু'ভাই — দু'জন রাজকুমার এ সময় এরাজ্যে বেড়াতে এসেছিল। বড় ভাইয়ের নাম ভুতুয়া আর ছোট ভাইয়ের নাম রাঙ্গিয়া। রাজা রাজ্য জুড়ে ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন — এ খবর ওদের কানেও গেল। ওরা রাজকুমারীকে এনে দিতে পারবে বলে এগিয়ে এল — রাজার ঢোল ধরল। রাজার লোকেরা দু'ভাইকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। ওরা রাজাকে বলল — "মহারাজ আমরা দু'ভাই আপনার মেয়েকে এনে দিতে পারব। আপনি অনুমতি করুন।" ওদের কি কি লাগবে, ওরা কি কি নেবে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। ওরা কোন কিছু না নিয়েই শুধু হাতে বেড়িয়ে পড়ল রাজকুমারীর সন্ধানে। পথে বেরিয়ে দু'ভাই সাদা হাতীর পায়ের চিহ্ন দেখে এগিয়ে যাবে বলে ঠিক করল। কিছু দূর যেতেই ভুতুয়া কুকুরের পায়ের দাগ দেখে রাঙ্গিয়াকে বলে উঠল —"দেখ দেখ, এইতো দেখছি সাদা হাতীর পায়ের দাগ। তুমি ফিরে যাও ভাই, আমি একাই যাব; আমি একাই ওকে বাগাতে পারব।" আরও খানিকটা এগিয়ে গেল ওরা। পথের পাশে এবার ভুতুয়া দেখল একটা বাঘের পায়ের দাগ। দাগগুলো ছিল খুব বড় বড়। ভুতুয়া রাঙ্গিয়াকে পায়ের দাগগুলো দেখিয়ে বলল —"এগুলো সাদা হাতীর পায়ের দাগ না হয়ে যায় না ভাই। আমি একাই ওকে ঘায়েল করতে পারব, তোমার দরকার হবে না। তুমি ফিরে যাও।" — "আচ্ছা, আচ্ছা, তা হবেখন, এবার, চলতে থাকো দিকিনি' রাঙ্গিয়া দাদাকে বলল।

একদিন —দু'দিন করে দিনের পরে মাস, মাসের পর বছর, দু'ভাই অবিরাম এগিয়ে চলল। ওরা যতই এগুচ্ছে — বন ততই গভীর হচ্ছে। এক রাজার রাজ্য ছেড়ে অন্য এক রাজার রাজ্যে পৌঁছে গেল ওরা। দুভাই যতই এগিয়ে যাচ্ছে — সাদা হাতীর পায়ের দাগগুলোও যেন বড় বড় বলে মনে হচ্ছে। এবার কিন্তু ভুতুয়া খুব ভয় পেয়ে গেল। সে রাঙ্গিয়াকে ডেকে বলল —"আমি ফিরে যাচ্ছি ভাই। কোথাকার কোন এক কুমারী — তার জন্য কিনা শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণ দেব?" রাঙ্গিয়া বলে —"তাড়াতাড়ি হেঁটে চল। আরও এগিয়ে যেতে হবে।" ভুতুয়ার যেন আর পা চলছে না। সে রাঙ্গিয়াকে বলল — "ভাই, ভাই, দেখছিস্ এটাই সাদা হাতীর পায়ের চিহ্ন হবে। বাপ্‌রে এক একটা পা যেন তাল গাছ। পাজিটা পেচ্ছাব করেছে পথের পাশে — একটা পুকুর হয়ে গেছে দেখছি!"

বন জঙ্গল ভেঙ্গে, পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে একদিন ওরা সত্যি সত্যিই সাদা হাতীর দেখা পেল। দূরে এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট শরীর আকাশের একদিক ঢেকে রেখেছে। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল রাঙ্গিয়া — তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। দু'জনেই

শক্তিশালী। দু'জনেই মরণ পণ লড়াই করতে লাগল। ওদের যুদ্ধে বন জঙ্গল কেঁপে উঠল। গাছ গরান ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। এমন ভয়ংকর লড়াই কেউ কোনদিন দেখেনি। এক নাগাড়ে কয়েকদিন লড়াই চলল। শেষ পর্যন্ত সাদা হাতীই হেরে গেল। রাঙ্গিয়া সাদা হাতীকে মেরে রাজকুমারীকে নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়াল।

ফিরে আসার পথে রাঙ্গিয়া অন্য এক রাজার রাজ্য হয়ে আসতে লাগল। পথে এক জায়গায় ওরা থেমেছে বিশ্রাম নিতে হবে। পাশেই বনের মাঝে একটা ঘর। ভুতুয়া রাঙ্গিয়াকে বলল — "ওই যে ভাই, একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। চল ও ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দি।" ভুতুয়া, রাঙ্গিয়া, আর রাজকুমারী তিনজন রাতটা ওখানেই কাটাবে বলে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের ভেতর যেন মানুষের হাড়ের পাহাড়। তবু থাকতে হবে রাতটা। ওরা ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইল রাতের মত।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। এমনি সময়ে তিন চারজন লোক একটি মেয়েকে নিয়ে ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। সবাই কাঁদছে। রাঙ্গিয়ারা কিছুই বুঝতে পারল না। রাঙ্গিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ওরা জিজ্ঞাসা করল — "তোমরা কোত্থেকে এখানে এলে? এ যে রাক্ষসী চাকবাইয়ামার ঘর তা কি জান না? এ তারই রাজ্য — আমরা সবাই তার প্রজা। এ রাজ্যের নিয়ম হল, প্রজাদের রোজ একজন করে লোক এনে চাকবাইয়ামাকে খেতে দিতে হবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে একদিনেই সবাইকে খেয়ে ফেলবে। আজ আমাদের পালা। তাই আমরা ওকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমরা এখানে এলে কেন? তোমাদেরও রাক্ষসী খেয়ে ফেলবে যে।" রাঙ্গিয়া কি এসবকে ভয় করে? সে বলল — "খেয়ে ফেললে কি আর করা যাবে বল? তবু খানিকটা দেখে নেব ভাবছি। তোমরা ওকে দিয়ে যেতে চাওতো দিয়ে যাও।" মেয়েটি ছিল এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। খানিক পরে ওকে ওখানে রেখে সবাই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। এবার ঘরে চারজন হল।

নিশুতি রাত। মেয়ে দু'টি আর ভুতুয়া ঘুমিয়েছে। রাঙ্গিয়া শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় অচমকা বনবাদাড় কাঁপিয়ে চাকবাইয়ামা দরজায় এসে রাজখাই কণ্ঠে বলতে লাগল —"ঘরে কে আছিস্?" রাঙ্গিয়া পাহারা দিচ্ছিল। ভেতর থেকে সে উত্তর দিল —"কেন, রাঙ্গিয়া জাগছে।" রাঙ্গিয়ার নাম শুনেই চাকবাইয়ামা পড়ি কি মরি দে ছুট্, সাদা হাতীর সঙ্গে রাঙ্গিয়ার লড়াইয়ের খবর চাকবাইয়ামাও পেয়েছিল। এদিকে চাকবাইয়ামার খিদেও পেয়েছিল খুব। তাই খানিকপরেই আবার ফিরে এল। এবারও রাঙ্গিয়ার নাম শুনেই ভয়ে পালাল। একবার দু'বার করে বার বার আসা যাওয়া চলল চাকবাইয়ামার। রাত ভোর হতে আর দেরী নেই। রাঙ্গিয়ার খুব ঘুম পেয়েছে। ভুতুয়াকে দরজায় পাহারা রেখে এবার রাঙ্গিয়া ঘুমুতে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল —"মনে রেখ দাদা, চাকবাইয়ামা এসে জিজ্ঞাসা করলে তোমার নাম বলো না কিন্তু। বলবে, রাঙ্গিয়া জেগে আছে। দাদাকে বুঝিয়ে রাঙ্গিয়া ঘুমুতে গেল।

একটু পরেই চাকবাইয়ামা আবার ফিরে এল। ছোটভাই রাঙ্গিয়া যেমনটি শিখিয়েছিল ভুতুয়া ঠিক তেমনি বলল —"রাঙ্গিয়া জাগছে"। রাঙ্গিয়ার নাম শুনেই চাকবাইয়ামা আবার পালাল। আসছে — যাচ্ছে এভাবেই চলতে লাগল। এদিকে ভুতুয়াও বার বার রাঙ্গিয়ার নাম বলতে গিয়ে তিতি বিরক্ত হয়ে গেছে। না — আর রাঙ্গিয়ার নাম বলছিনা। এবার এলে আমার নামই বলে দেখব কী হয় দেখা যাবে। আমি কি ওর চাইতে কিছু কম? আবারও চাকবাইয়ামা এসে জিজ্ঞাসা করল —"ঘরে কে আছিস্"? ভুতুয়া এবার গলা চড়িয়ে বলে উঠল — "কেন? ভুতুয়া জাগছে।" ভুতুয়ার নাম শুনেই চাকবাইয়ামা এক লাথিতে দরজাটা ভেঙ্গে ফেলল। দরজা ভাঙ্গতেই ভুতুয়ার মুখোমুখি হল। বাঁচি কি মরি — দু'জনে লড়াই সুরু করে দিল। ওদের লড়াইতে বন জঙ্গল কাঁপতে লাগল। এদিকে রাজ্যের মানুষ ভাবছে, চাকবাইয়ামা আজ এত উথার পাথার করছে কেন? কেউ হয়ত ওকে মেরে ফেলছে। রাত ভোরে চাকবাইয়ামা ভুতুয়াকে পাশের জঙ্গলটায় ফেলে দিয়ে মেয়ে দু'টিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। ভুতুয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

রাত ভোর হল। রাঙ্গিয়া জেগে দেখল ভুতুয়াও নেই, মেয়ে দু'টিও নেই। রাতের লড়াইয়ের খবর রাঙ্গিয়া বলতেই পারে না। অনেক রাতে ঘুমিয়েছিল বলে ঘুমটাও বেশ হয়েছিল। ঘরের এদিক ওদিক দেখল, নাঃ কোথাও কেউ নেই, ব্যাপারখানা কি? বাইরে এসেও ভাল করে দেখে নিল ও। কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর ভুতুয়াকে অজ্ঞান হয়ে জঙ্গলে পরে থাকতে দেখল। রাঙ্গিয়া ভুতুয়াকে সেবা শুশ্রূষা করে ভাল করে তুলল। জ্ঞান ফিরে এলে ভুতুয়া একে একে রাতের ঘটনা সবই শোনাল। রাঙ্গিয়া ভাবে, সাদা হাতীকে মেরে এত কষ্ট করে রাজকুমারীকে নিয়ে এলাম; আজ সে কিনা রাক্ষসীর পেটে যেতে বসেছে। রাঙ্গিয়া আবার চলল চাকবাইয়ামাকে ধরতে। বন জঙ্গল সব আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াতে লাগল ও। দু'তিন মাস ধরে চলল খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথায় কে? চাকবাইয়ামার টিকিটিরও সন্ধান পেল না। একদিন দুপুর বেলা — সেই সকাল থেকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রাঙ্গিয়া। পাহাড়ের উপরে গাছের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে খানিক। এমনি সময় —দূরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে 'বাইলিংচিং" এর (এক প্রকার বনজ গাছ) একটা মরা ঝাড় দেখতে পেল। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে বাইলিংচিং গাছ কখনও মরে না। তাইতো, এ ঝাড়টা মরল কেন? রাঙ্গিয়া মনে মনে ভাবছে। কাছে গিয়ে রাঙ্গিয়া বাইলিংচিং এর ঝাড়টা টেনে তুলতেই —বাপ্ রে? এযে দেখছি এক প্রকাণ্ড গর্ত; পাতাল পর্যন্ত চলে গেছে। হাঁ তাহলে এপথেই চাকবাইয়ামা পালিয়েছে। কিন্তু গর্তে ঢুকব কি করে? বন থেকে একটা "সাকাই" (ঘিলা) লতা এনে ওটাই লম্বা করে সুড়ঙ্গের পথে গলিয়ে দিল রাঙ্গিয়া। এবার দু'ভাই লতা ধরে সুরঙ্গের পথে নীচে নেমে গেল। সুরঙ্গের অনেক অলি গলি পেরিয়ে এক সময় চাকবাইয়ামার দেখা পেল ওরা। এবার যাবে কোথায়? দেখা পেতেই রাঙ্গিয়া ঝাপিয়ে পড়ল চাকবাইয়ামার উপর। দুজনের মধ্যে সুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। কিন্তু রাঙ্গিয়ার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? সাদা হাতীকে যে ঘায়েল করেছে, চাকবাইয়ামাতো তার

কাছে নস্যি। বেশী যুদ্ধ করতে হল না রাঙ্গিয়ার। জুতসই এক প্যাঁচেই সে চাকবাইয়ামাকে কুপোকাৎ করে ফেলল। তারপর টেনে টেনে রাঙ্গিয়া ওর পাগুলো ছিড়ে ফেলল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে একসময় মরে গেল। ওই সুড়ঙ্গের ভেতরই এক জায়গায় রাজকুমারী ও ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে পাওয়া গেল। মেয়ে দু'টির উপর রাক্ষসীর মায়া পড়েছিল — তাই হয়ত ওদের খায়নি।

এবার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার পালা। যে লতাটা ধরে ওরা নীচে নেমেছিল ওটা বেয়েই ভুতুয়া প্রথমে উপরে উঠে এল। তারপর একে একে রাজকুমারী ও মেয়েটিকে উপরে তুলে দিল রাঙ্গিয়া। সবার শেষে রাঙ্গিয়া উঠে আসবে। এদিকে ভুতুয়ার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। রাঙ্গিয়াকে মেরে কি করে রাজকুমারীকে বিয়ে করা যায় সে কথাই সে ভাবতে লাগল। এইতো সুযোগ। রাজকুমারী ও মেয়েটিকে উপরে তুলেই বেয়ে উঠার লতাটা কেটে দিল ভুতুয়া। সুড়ঙ্গের মুখেও মস্ত একখানা পাথর চাপা দিয়ে রাখল। এবার রাঙ্গিয়া, চিরদিনের মত ওখানেই তিলে তিলে পচে মরগে।

রাজকুমারী আর ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে নিয়ে ভুতুয়া সেখান থেকে সোজা ব্রাহ্মণের বাড়ী চলে এল। সেখানে মা বাবার কাছে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়ে ভুতুয়া রাজকুমারীকে নিয়ে রাজার কাছে এসে হাজির হল। সেখানে পৌঁছে সে রাজাকে বলল — "ধর্মাবতার, মহারাজ, আপনার মেয়েকে নিয়ে এসেছি। এবার রাজকুমারী সহ রাজ্যের অর্ধেক আমাকে দিন; আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।" রাজা রাঙ্গিয়ার খবর জিজ্ঞাসা করতেই — "হাঁ— কপাল, ছোটভাই রাঙ্গিয়াকে তো চাকবাইয়ামা গিলে ফেলেছে। ভাগ্যিস আমি ছিলাম। শেষ পর্যন্ত চাকবাইয়ামাকে মেরে আমিই রাজকুমারীকে উদ্ধার করে এনেছি। রাজা ভুতুয়ার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগলেন। এদিকে রাঙ্গিয়া যে মরেনি রাজকুমারী তো তা নিজের চোখেই দেখেছিল। তাই রাজার কাছে খবর পাঠাল —"সে একটা ব্রত পালন করছে। ব্রতের এক বছর না গেলে কিছুতেই সে বিয়ে করবে না।" ভুতুয়া আর কি করে! বাধ্য হয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হল।

এদিকে সুড়ঙ্গের ভেতর রাঙ্গিয়া। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কি করে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসবে এ কথাই সে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, তাইতো টেকে যে একটা "সাকাই" (ঘিলা) রয়েছে! রাঙ্গিয়া মন্ত্র পড়ে ওটা মাটিতে পুঁতে দিতেই একটা লতা গজিয়ে উঠল। লতাটা বড় হতে হতে একসময় সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সূর্যের আলোকের নাগাল পেল। চারিদিকের গাছ পালাকে জড়িয়ে ধরল লতাটা। এবার ওই লতাটা বেয়েই রাঙ্গিয়া সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। অনেকদিন পর আবার রাঙ্গিয়া সূর্যের আলোক দেখতে পেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে রাঙ্গিয়া সোজা এল ব্রাহ্মণের ঘরে। এই ব্রাহ্মণই তার মেয়েকে চাকবাইয়ামাকে ভেট পাঠিয়েছিল। রাঙ্গিয়াকে দেখে ওরা যারপরনাই খুশি হল।

রাঙ্গিয়াও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে ওর কাহিনী বলে শোনাল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দু'জনেই ওকে নিজের বাড়ীতে রেখে দিল — আর রাজার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। রাঙ্গিয়া মরেনি, বেঁচে আছে —একান সেকান করে কথাটা একদিন রাজার কানেও পৌঁছল। রাজা খুব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তক্ষুণি পাইক পাঠালেন রাঙ্গিয়াকে নিয়ে আসতে। রাজকুমারী রাঙ্গিয়াকে দেখেই চিনে ফেলল। সে তার বাবাকে বলল —"ওই-ই সাদা হাতী আর চাকবাইয়ামাকে মেরে ওদের বাঁচিয়েছে।" সব শুনে রাজা রাঙ্গিয়ার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে দিলেন; সঙ্গে অর্ধেক রাজ্যও তাঁকেই দিলেন। ভুতুয়া আর কি করবে! রাজা ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গেই ভুতুয়ার বিয়ে দিয়ে দিলেন। কেননা, চাকবাইয়ামা ব্রাহ্মণের মেয়েকে খেয়ে ফেললেও খেতে পারত।

রাজ্যের অর্ধেক পেয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে রাঙ্গিয়া সুখেই দিন কাটাতে লাগল। ভুতুয়াকেও সে কিছুটা না দিয়ে রইল না। কেননা সে যাই হোক, বড় ভাইতো! ❑

ছাতিম গাছের কাহিনী

ভাই আর বোন। ভাই বড়, বোন ছোট। দু'জনে জুমে যাচ্ছিল। ছোট বোন আগে যাচ্ছিল— দাদা তার পেছনে। ওদের জুমে যেতে হলে একটা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। নদীর উপর সাঁকো নেই। তাই হেঁটেই নদী পার হতে হয়। নদীর উপর দিয়ে হেঁটে পার হওয়ার সময় 'রিগনাই'(ত্রিপুরীদের নিজস্ব তাঁতে তৈরী শাড়ী বিশেষ) ভিজবার ভয়ে মেয়েটি রিগনাইটা বেশ কিছুটা তুলে নিল। পেছন থেকে দাদা তার ধবধবে নিটোল উরু দুটো দেখতে পেল। ভারী মনে ধরল ওর, ভাবান্তর হল। তাই জলের পথে আর না এগিয়ে ওখানেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ভাইটি। এদিকে ছোট বোন নদীর ওপার গিয়ে পেছনে ফিরে দেখল— দাদা আসছে কিনা! দাদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছোট বোন বলে উঠল— "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে! তুমি আজ যাবে না দাদা? বেলা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এস, জুমে কাজ করতে হবে। ভাইটি কিন্তু বোনের কথায় উত্তর না দিয়েই ঘরে ফিরে এল— জুমে আর যাওয়া হল না।

সেদিন থেকে ভাইয়ের মনে শুধু বোনের চিন্তাই লেগে আছে। কাজেও মন নেই, চোখেও ঘুম নেই। কোন কিছুতেই মন বসে না। এদিক ওদিক শুধু ঘুরে বেড়ায়।

ছেলে দিনরাত মুখ ভার করে থাকে। ছেলের ভাবান্তর দেখে বাবা মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি জানি কেন, হঠাৎ ছেলের এমন হল! ওকে জিজ্ঞাসা করেও মা-বাবা কিছুই জানতে পারল না। একদিন ওর ঠাকুরমাই ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল — "কিরে দাদু, তোর কি হল বল দিকিনি; নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সারাদিন কেবল ঘুরে বেড়াস। তুই কি বিয়ে করতে চাস্?" নাতিটি উত্তর দিল — "হ্যাঁ, আমি বিয়ে করতেই চাই।" — "তা হলে কোথায় মন মজেছে বল না, আমরা যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে পারি।"

ঠাকুরমা একে একে গাঁয়ের সব সোমত্ত মেয়েদের নাম বলে গেল। কিন্তু কারো নামেই সাড়া দিলে না ও। বার বার জিজ্ঞাসা করেও সাড়া না পেয়ে বুড়া ঠাকুরমা খুব রেগে গেল; আর কত জিজ্ঞাসা করবে "তাহলে তুই কাকে চাস বল? গাঁয়ের সব সোমত্ত মেয়েদেরই তো নাম বললাম। নাম করিনি শুধু তোর ছোট বোনের। তাহলে কি তুই ছোটবোনকেই বিয়ে করতে চাস?"

নাতিটির কাছ থেকে এবার সাড়া এল। মাথাটা নেড়ে সে জানাল, 'হ্যাঁ তাকেই ওর চাই।' ঠাকুরমা বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ল। কি সৃষ্টিছাড়া কথা ছেলের! আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এরকম করেনি, এতে দোষ হবে ইত্যাদি কতভাবেই ওকে বুঝিয়ে বলল। কে কার কথা শোনে! ছেলে যে গোঁ ধরে বসে আছে; তা থেকে এক চুলও নড়ানো গেল না ওকে। ছোটবোনকে বিয়ে করতে না পারলে সে ঠিকই মরবে।

অনেক বুঝিয়ে সুজিয়েও যখন কোন কাজ হল না, ঘরের বড়রা সবাই মিলে পরামর্শ করে বোনের সঙ্গেই ওর বিয়ে দেবে ঠিক করল। কথাটা কিন্তু গাঁয়ের আর পাঁচজনকে না বলে গোপন করেই রাখল। নিজেরাই দু'একটি করে বিয়ে বাড়ীর কাজকর্ম গুছিয়ে আনতে লাগল। বর কনের জন্য একটা নতুন ঘর বানানো হল। বিয়ে বাড়ীর ভোজের জন্য চাল করা হল। নাতনিটিও কিছু আঁচ করতে পারছে না। দেখে শুনে ও ভাবছে, ওরা বিয়ে বাড়ীর চাল কুটছে বটে, তবে কার বিয়ে! ওর, না দাদার? গাঁয়ের বান্ধবীরাও ওকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে — ও কিছুই বলতে পারে না; লজ্জিত হয়। "তাহলে তোর দাদার সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে" — এসব বলে ওরা ঠাট্টা করে। লজ্জার মাথা খেয়ে এসব কথা কাউকে ফিরে জিজ্ঞাসাও করা যায় না। অথচ মনের মাঝে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

একদিন নাতনিটি ওর ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করল। ঠাকুরমা বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ল। মুখ ভার করে বলে — 'তাও আমি কি করে বলব কার বিয়ে! ঘর গেরস্তালীর কোন্ খবরটাই আমি রাখি বল?' সুবিধে হল না বলে নাতনিটি সেদিনকার মত সেখানেই চুপ করে রইল।

এমনি সময় — বুড়ি ঠাকুরমা একদিন বিয়ে বাড়ীর মদ রাঁধবার বিন্নী ধান রোদে দিয়েছে। ঘরে কেউ নেই— যে যার মত কাজে গেছে। নাতনিটি কিন্তু জুমের পথ থেকেই ফিরে এল — কাজে যেতে মন সরছিল না। মনে সাত পাঁচ কত চিন্তা। তাই চুল এলিয়ে উঠোনে চাটাইর এক কোণে গিয়ে রোদে বসল। আর আপন মনে চুলের কাঁটাটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চাটাইর উপর ঠুকতে লাগল। পাখী চাটাই থেকে ঠুকরিয়ে ধান খেলে যেমনি ঠুক ঠুক শব্দ হয় — চাটাইতে চুলের কাঁটা ঠোকার শব্দটাও ঠিক তেমনি হতে লাগল। ঠাকুরমা বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখতে পেত না। পাখী ধান খাচ্ছে কি অন্য কিছুতে শব্দ করছে ঠাওরাতে পারল না। তা নিশ্চয়ই পাখি হবে — মনে করে বুড়ী 'ছোঁ — উ' করে পাখি তাড়াল। আর পাখিগুলোকে সুর করে বকতে লাগল — আমার নাতি নাতনির বিয়ে বাড়ীর মদের জন্য বিন্নী রোদে দিয়েছি; অপয়া পাখী সব — কোন মশান থেকে উড়ে এসে খেতে লেগেছিস?" নাতনি চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করল — "কি বললে ঠাকুরমা? কাদের বিয়ের কথা বললে? দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে? এ্যাদ্দিন তোমরা গোপন করে রেখেছিলে, আজ বলে ফেললে।" আচমকা কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বলে বুড়ী চমকে উঠল। নাতনির কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বুড়ী তখনকার মত চুপ করে গেল।

ভাই বোনের বিয়ে — এমন আজগুবি কথা কেউ কোনদিন শুনেনি। এর চাইতে মরে যাওয়াও অনেক ভাল। একথাগুলোই বার বার মেয়েটির মনে বাজতে লাগল। সেদিন রাত্তিরেই সে স্বপ্ন দেখল। একজন দেবতা এসে ওকে বলছে — "শোন্ মেয়ে, একটা ছাতিমের চারা এনে পুজো কর। তা'হলেই তুই মুক্তি পাবি; তোর দুঃখ দুর হবে।"

পরদিন গাঁয়ের মেয়েরা বনে যাচ্ছে। সেও গেল ওদের সঙ্গে। বনে গিয়ে যে যার মত কাজ করছে কেউবা নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছে। সে-ই কেবল কাজ না করে একা একা পুরানো জুমের চারদিকে ছাতিমের চারা খুঁজে বেড়াতে লাগল। খুঁজে পেতে এক সময় ছোট্ট একটা ছাতিমের চারা পেয়েও গেল। ওটাকেই উঠিয়ে এনে জুমের একপাশে খানিকটা জায়গা ঠাই করে পুঁতে দিলে। এবার গাছটার চারপাশে জল ঢেলে পুজো করতে লাগল আপন মনে। এভাবে পুজো করতে করতে একসময় গাছটা বড় হয়ে উঠতে লাগল। এবার মেয়েটি সে ছাতিম গাছের ওপর চেপে বসেই সুর করে গেয়ে উঠল —

দাদা বাই আংবাই কাইনানি হিনাই—

লগ্ চেথুয়াং লগ্ —।

অনুবাদ — ওগো ছাতিম, দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছে। তুমি ক্রমশ বড় হতে থাকো।

তার গানের তালে তালে গাছটাও ধীরে ধীরে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে বেড়ে যেতে লাগল। গাঁয়ের মেয়েরা বাড়ী ফিরে এলে মেয়েটির মা মেয়ের বান্ধবীকে মেয়ে ফিরে

এল না কেন জিজ্ঞাসা করল। ওর বান্ধবী বলল — "মারের (বান্ধবীর) যে আজ কি হল! বনে গিয়ে কোন কাজ না করে কোত্থেকে একটা ছাতিমের চারা খুঁজে এনে ঠাই করা জায়গায় পুঁতে পুজো দিতেই ওটা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। কিছু বড় হতেই 'মারে' ও গাছটার ওপর চেপেই গাইতে লাগল, "ওগো ছাতিম, তুমি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হও।" ও যতই গাইছে ওর গানের তালে তালে গাছটাও ততই আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে উঠছে।

একথা শুনেই মা বাবা আঁৎকে উঠল। কি হতে যাচ্ছে ওরা কিছুটা আঁচ করতে পারল। তাই তাড়াতাড়ি পড়শীদের সঙ্গে নিয়ে শীগ্‌গীর জুমের পাশের ছাতিম তলে গিয়ে হাজির হল। সঙ্গে দা, কুড়ুল নিতেও ভুলল না। এ সময়ের মধ্যে ছাতিম গাছটা মেয়েটিকে মাথায় নিয়ে আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে। মা বাবা ওপর দিকে মাথা তুলে মেয়েকে নেমে আসতে খুব করে বলল। মেয়ে কিন্তু কিছুতেই নেমে এল না। মেয়েও নেমে আসছে না, ওদিকে গাছও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে দেখে পড়শীরা সবাই মিলে গাছটার গোড়াকেই কোপাতে লাগল।

ওদিকে গাছের ডগায় বসে মেয়েটি গাইছে —

ফুংছা তাংখিনি ফুংবা বারিদি;
লগ্ চেথুয়াং লগ্।
দাদাবাই আং বাই কাইনানি হিনাই —
লগ্ চেথুয়াং লগ্।

অনুবাদ — ওগো ছাতিম গাছ, তোমাকে এক কোপে যতটুকু কাটছে, তার পাঁচগুণ বড় হও তুমি। তুমি বেড়ে চলো। দাদার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিতে চাইছে — তাই ওগো ছাতিম, তুমি আরও বড় হতে থাকো।

নীচে পড়শীরা ছাতিম গাছকে যতই কাটছে — ওটা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। কেটে আর শেষ করতে পারছে না। উপায় না দেখে বাবা বাধ্য হয়েই এবার মেয়েকে বলল — নেমে এস মা, তোমাকে দাদার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি না। ওকে এক্ষুণি কেটে ফেলব। এই বলে বাবা কোত্থেকে একটা কালো কুকুর এনে রক্তগুলো দেখাল মেয়েকে। গাছের উপর থেকেই মেয়ে এবার বলে উঠল —

'আঙবা ছিয়াদে আঙবা ছুগয়াদে?
ছাইলা কছম তান।'

অনুবাদ — আমি কি জানিনি, আমি কি দেখিনি, তোমরা যে কালো কুকুর কেটে এনেছ।

মেয়েটি আরও বলল —

দখিন গীলানি নবার ছিবাইদি —
বাবুন খুলুম নানি।
উতুর গীলানি নবার ছিবাইদি —
মা-ন খুলুম নানি।

অনুবাদ — দখিনা হাওয়া, তুমি বইতে থেকো; বাবাকে প্রণাম করছি। উত্তুরে হাওয়া, তুমি বইতে থেকো; মাকে প্রণাম করছি।

মেয়েটি গান গাইছে — ওদিকে হাওয়াও বইতে শুরু করেছে। ছাতিম গাছের চূড়াটাও এতক্ষণে আকাশ ছুঁই ছুঁই। এবার মেয়েটি সেখান থেকেই মাথা নত করে মা-বাবাকে গাঁয়ের গুরুজনদের প্রণাম জানাল। এবার চিরদিনের মত বিদায়ের পালা। চোখের জল ফেলে একসময় মেয়েটি সোজা হয়ে আকাশে মেঘের ওপারে উঠে গেল।

নীচে দাঁড়িয়ে ভাই দেখছিল — বোন একটু একটু করে আকাশের বুকে উঠে যাচ্ছে। সে তর তর করে গাছে উঠে গেল — বোনকে নামিয়ে আনবে। কিন্তু বোনকে ও ছুঁতেও পারল না। ওদিকে আকাশে উঠে যাবার সময় দাদা যেন কখনো ওর নাগাল না পায়, ভাইয়ের মলিন লালসা কোনদিনই যেন ওকে ছুঁতে না পারে তার ব্যবস্থা করে গেল। আকাশে উঠে যাবার সময় পা দিয়ে ছাতিম গাছের মাথাটা ভেঙ্গে দিয়ে গেল। এক 'আকাশ ফাটা' শব্দে গাছের চূড়াটা মাটিতে ভেঙ্গে পড়ল।

সেদিন থেকে আজ অবধি কখনও আকাশ কালো হয়ে কড় কড় করে উঠলেই — সেই ছাতিম গাছের কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয়। থেকে থেকে বিজলী চমকালে মনে হয় যেন সেই মেয়েটি কখনো কোমরের 'রিগনাই'টা ভাল করে এঁটে দেবার সময় পলকের জন্য তার উরুদেশ দেখতে পাচ্ছি।

সেদিন থেকে ছাতিম গাছের মাথা নেই — সে যেন ভোঁতা হয়ে গেছে ❑

ছিপিংতুই — মাইরুংতুই

ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক ঘর। এক জুম চাষী। জুমিয়ার দুই বিয়ে। বড় বৌ-এর দিকে একমাত্র মেয়ে ছিপিংতুই। ছোট বৌ-এর দিকে এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের নাম মাইরুংতুই, ছেলের নাম অগুরায়। জুমিয়ার ঘরে কোন অভাব ছিল না।

এমনি দিনে জুমিয়ার বড়- বৌ ছিপিংতুই এর মা নাম না জানা অসুখে মারা গেল। সেই থেকে ছিপিংতুই তার বিমাতার কাছে থাকে । বয়স বাড়তে লাগল। মা মরা ছিটিংতুই-এর রং কালো হলে কি হবে শরীরের গড়ন ছিল ভারী সুন্দর। তাঁতের কাজ, জুমের কাজ, ঘরকন্নার কাজ সবই সে খুব ভালভাবে করতে পারত। তার বোন মাইরুংতুই ছিল তার বিপরীত। সে ছিল খুব আলসে। ঘরকন্নার কাজ, জুমের কাজ, তাঁতের কাজ কোন কিছুই সে ভালভাবে করতে পারত না। কিন্তু তাহলেও ছিপিংতুইকে ও ভারী হিংসা করত। ভাল রিগনাই (শাড়ী), রিছা (বক্ষবন্ধনী) গুলোও নিজেই পরত, ছিপিংতুইকে দিত না। দু'জনে

জুমে কাজ করতে গেলে ভাল দাখানা নিজেই নিয়ে নিত — ছিপিংতুইকে খারাপ দাখানা দিয়েই কাজ করতে হত। তবু মুখ ফুটে ছিপিংতুই কোন কথা বলত না।

একদিন কি হল, দু'বোন যখন জুমে কাজ করছে, গাছ থেকে একটা পাখি বলে উঠল — 'ওই ময়লা রিগনাই পরা মেয়েটি যদি রাজরাণী হত তাহলে কি ভালই না হত। একথা শুনেই মাইরুং দিদিকে বলল — "দিদি, দিদি আমার রিগনাই ও দাখানা তুমি নিয়ে নাও, আর তোমার ওগুলো আমাকে দাও। ছিপিংতুই তাই দিল। এবার পাখিটা বলে উঠল — "ওই পরিস্কার রিগনাই পরা মেয়েটি যদি রাজরাণী হত তাহলে কি ভালই না হত!" একথা শুনে মাইরুংতুই খুবই রেগে গেল। দিদিকে বলে এবার তার রিগনাই ও দাখানা ফিরিয়ে নিল। এমনি করেই ছিপিংতুই এর দিন যাচ্ছে।

আর একদিনের কথা। সেদিন দুপুরবেলা জুমের কাজের ফাঁকে দু'বোন টংঘরে উঠে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমনি সময়ে রাজার লোকেরাও ওদের জুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ভর দুপুরে রোদে হেঁটে ওদেরও খুব তেষ্টা পেয়েছিল। কাছে পিঠে কোথাও জল না পেয়ে ওরা মাইরুংতুই এর নিকট এসে জল খেতে চাইল। মাইরুং তার 'তিলক' (জল রাখার জন্য শুকনো লাউয়ের খোসা) থেকে ওদের জল খেতে দিল সত্যি, কিন্তু রাজার লোকেরা জলে বিচ্ছিরি গন্ধ বলে খেতেই পারল না। জল না খেয়েই ফিরে যাচ্ছিল ওরা। ছিপিংতুই ওদের ডেকে যত্ন আত্তি করে বসিয়ে ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দিলে। ছিপিংএর মিষ্টি ব্যবহারে রাজার লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

রাজধানীতে ফিরে 'বিরিনদিয়ারা' (পুলিশগণ) সবাই ছিপিংতুই এর খুব প্রশংসা করল। রাজাও ওদের কথা শুনলেন। রাজাও এমন একটি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে খুঁজছিলেন বিয়ে করবেন বলে। বিরিনদিয়াদের কথায় রাজার ছিপিংতুইকে দেখবার খুব ইচ্ছে হল। রাণী করে ঘরে আনার আগে রাজা নিজের চোখে একবার দেখে নিতে চান তার ভাবী রাণীকে।

বিরিনদিয়ারা রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ছিপিংতুইদের গাঁয়ে। ছিপিংতুই যে পথে নদীর ঘাটে যাবে তারই পাশে ঘোড়া থামিয়ে রাজা লুকিয়ে রইলেন। খানিক বাদেই ছিপিংতুই আর মাইরুংতুই ওপথে নদীতে যাচ্ছে জল আনতে। দূর থেকেই বিরিনদিয়ারা ছিপিংতুইকে দেখিয়ে দিলে। এক পলক দেখেই ছিপিংতুইকে রাজার ভারী পছন্দ হল। বাঃ — ভারী মিষ্টি চেহারাতো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাইরুংতুই ভয়ে যেদিকে পথ পেল পালিয়ে গেল। রাজা ছিপিংতুইকে ঘোড়ায় তুলে রাজধানীতে ফিরে এলেন। বাড়ী গিয়ে মাইরুং মাকে সব কথা বলতেই মা কেঁদে আকুল। তার মেয়ে মাইরুংতুইকে ফেলে কিনা রাজা শেষপর্যন্ত ছিপিংতুইকে নিয়ে গেলেন! মেয়ে মাইরুংতুই এর আর রাণী হওয়ার কপাল হল না। কেঁদে কেটে কি আর হবে। যা হবার তো হয়ে গেছে। মনে মনে মাইরুংতুই এর মা অন্য বুদ্ধি আঁটতে লাগলেন।

রাজা ছিপিংতুইকে রাজবাড়ীতে এনে খুব জাঁকজমক করে বিয়ে করলেন। রাজরাণী করে তাকে সিংহাসনে নিজের পাশে বসালেন। রাণী হলেও ছিপিংতুই অন্য রাণীদের মত কুঁড়ে ছিল না। অবসর সময়ে রেশমী সূতার রিছা বুনত। দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল। ছিপিংতুই এর কোলে একটি ছেলে এল। চাঁদের মত ছেলের মুখ দেখে রাজার মনে আনন্দের অবধি নেই। রাজ্যজুড়ে উৎসবের ঢেউ বয়ে গেল। এদিকে মাইরুংতুই এর মা ছিপিংতুইয়ের সুখের খবরে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল মাইরুংকে কি করে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায় এ চিন্তাই দিনরাত করতে লাগল।

ছিপিংতুই সেই যে রাজবাড়ীতে গিয়েছে, একবারও আর গাঁয়ে আসেনি। তাই বিমাতা দু'একদিন পর পরই ছিপিংকে খবর পাঠাত, বাড়ীতে এসে বেড়িয়ে যাবার জন্য। কিন্তু গাঁয়ে যেতে ছিপিংতুই রাজার কাছে অনুমতি চেয়েছে কি জানি কি ভেবে ততবারই রাজা নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন — দেখ ছিপিং, তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাতে আমার খুব ভয় করে। তোমার সৎমাটি খুব ভাল মানুষ নন। তুমি সেখানে যেয়ো না।" রাজা যেতে বারণ করেন, তাই ছিপিং এরও আর বাপের বাড়ী যাওয়া হয়ে উঠে না। বার বার খবর দিয়েও যখন ছিপিংতুই আসছে না, মাইরুং এর মা তখন একটা বুদ্ধি বের করল। ছিপিংকে না আনতে পারলে যে কিছুই করা যাচ্ছে না। যে করেই হোক ওকে আনা চাই। বাবার অসুখ বলে এবার সে ছিপিংয়ের নিকট খবর পাঠাল। বাবার অসুখ শুনে ছিপিং তো কেঁদেই আকুল। এ অবস্থায় রাজাও বাপের বাড়ীতে যেতে ছিপিংকে আর মানা করতে পারলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে যেতে দিতে হল। যাবার সময় রাজা রাণীকে বলে দিলেন — "ছিপিং, যত শীগ্‌গীর সম্ভব তুমি ফিরে এস। তোমাকে ছাড়া আমার খুব অসুবিধা হবে। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব।" রাজাকে প্রণাম করে ছিপিংতুই বাপের বাড়ী চলল।

ছিপিং বাপের বাড়ীতে এসে দেখে বাবা নেই — মরে গেছে। বাবার কথা মনে করে খুব কাঁদল ছিপিং। মাকে যখন হারিয়েছে তখন জ্ঞান হয়নি, এবার বাবাকেও হারাল। সংসারে তার আর কেউ রইল না। সাথে সাথেই ছিপিং রাজবাড়ীতে ফিরে যাচ্ছিল। কি হবে আর থেকে। কিন্তু ছোট বোন মাইরুং ও বিমাতা দু'একদিন থেকে যাবার জন্য ওকে খুব পীড়াপিড়ি করতে লাগল। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত থাকতেই হল। সঙ্গের লোকজনদের দুদিন পরে এসে নিয়ে যেতে বলে পাঠিয়ে দিল।

বিকেল বেলা। ছিপিং আর মাইরুং দাওয়ায় বসে গল্প করছিল। মাইরুং বলল — "আয়ে না দিদি; অনেকদিন হয় তোর চুল আঁচড়ে দিইনি। আয়, তোকে একটু আঁচড়ে দিই। এ কথায় ছিপিং কিছুতেই রাজী হল না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! চিরুণী এনে মাইরুং প্রায় জোর করেই দিদির মাথা আঁচড়াতে লাগল। আসার সময় রাজা নিজের হাতে ছিপিং এর মাথায় একটা ফুল গুঁজে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, ফুলটা না ফেলতে। এফুল যতক্ষণ খোঁপায় থাকবে ততক্ষণ ওর কোন বিপদ আপদ হবে না। চুল আঁচড়াতে

গিয়ে মাইরুং কিন্তু ফুলটা ওদের টংঘরের নীচে ফেলে দিলে। ছিপিংয়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে বোনকে বলল — "বোন আমার ফুলটা তুলে এনে দে শীগ্‌গীর। রাজা নিজের হাতে এ ফুল মাথায় গুঁজে দিয়েছেন। রাজার দেওয়া জিনিষ অবহেলা করতে নেই। রাজা শুনলে ভারী রাগ করবেন।" মাইরুং দিদিকে বলল — "ওখানে কি করে যাই বল? দেখতেই পাচ্ছ, একগাদা শূয়োরের নাড়ি জমে আছে। তা — এরকম ফুল কি আর নেই? আর একটা পরে নিলেই হবেখন।" ওর কথা কানে না তুলে ছিপিং নিজেই নীচে নেমে গেল ফুলটা তুলে আনতে। মাইরুং আর তার মা এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। যেই না ছিপিং নীচু হয়ে ফুল তুলতে যাবে অমনি তার মাথায় এক হাঁড়ি গরম জল দিলে। গরম জলে ছিপিংয়ের সমস্ত শরীরটা পুড়ে গেল — যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। মরে গেছে ভেবে মা - মেয়ে ছিপিংকে বস্তায় পুরে দূর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এল। বাড়ী ফিরে মাইরুংতুই ছিপিংয়ের পোষাকগুলো পরে সেজে গৃহে রাণী হয়ে বসে রইল। রাজবাড়ী থেকে ছিপিংকে নিতে এলে মাইরুং ওদের সঙ্গে রাজবাড়ীতে চলে গেল।

রাণী ফিরে এসেছেন। রাজার মনে ভারী আনন্দ। কিন্তু ওমা? রাণীকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। রাণী তো এত ফর্সা ছিল না। কথাবার্তাও যেন ঠিক ঠিক মিলছে না। রাজা কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বললেন না। রাণী রেশমী সূতো দিয়ে রিছা বুনতে গেল। বার বারই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কোনদিনই এ কাজ করেনি কিনা তাই। এমন সময় হঠাৎ একটা পাখি রাণীকে লক্ষ্য করে বলে ওঠল — "দুটো ফেলে তিনটে নাও, তিনটে ফেলে দুটো নাও।" রাণীর ভারী রাগ হল। মাইরুংয়ের মনে হল, ছিপিংই যে পাখি হয়ে এসে এসব বলছে। মাইরুং পাখিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল খুব। পাখিটা কিন্তু কিছুতেই গেল না। এ-ডাল ও-ডাল করে রয়েই গেল। কথাটা রাজার কানেও গেল। শুনে রাজার মনও খারাপ হয়ে গেল। দিন দিনই রাজার সন্দেহ বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু সন্দেহ দূর করবার উপায়ও খুঁজে পেলেন না। তাই কাজেকর্মেও মন বসছিল না। শিকারে গেলে হয়ত মনটা কিছু ভাল হতে পারে ভেবে রাজা একদিন শিকারে যাবেন বলেই ঠিক করলেন। তিনি রাণীকে ডেকে বললেন "আমি আজ শিকারে যাব রাণী। দু'একদিন দেরী হবে।" লোকজন নিয়ে সেজেগুজে রাজা শিকারে চললেন।

রাজার মনে সুখ নেই। তিনি রাণীর কথাই দিনরাত ভাবছেন। ছিপিংয়ের এরকম হাল হল কেন, তাই শুধু তার ভাবনা। শিকারেও মন বসছিল না। সারাদিন ঘুরেও একটা শিকার মিলল না। ক্লান্ত, অবসন্ন রাজা সন্ধ্যা নাগাদ তার পোষা হরিণের ঘরে গেলেন। এ হরিণটার জন্য রাজা বনের ভেতর সুন্দর একটা ঘর তুলে দিয়েছিলেন। যত্ন আত্তি করার জন্য লোকও রেখে দিয়েছিলেন। হরিণের কাছে গিয়ে রাজা বললেন — "আজ আর কিছুই ভাল লাগছে না। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমার ঘরেই আজ রাতটা কাটাব ভাবছি।" হরিণ বলল — না 'না মহারাজ তা হবে না।' রাজা অবাক হয়ে ভাবলেন, হরিণতো কোনদিন এভাবে বলেনি। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে। তিনি হরিণকে তার

কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হরিণ কিন্তু কিছুতেই কিছু বলতে রাজী হল না। রাজাও না জেনে ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত হরিণ বলতে বাধ্য হল। হরিণ চোখের জল ফেলে বলতে লাগল — রাণীর দুঃখের কাহিনী। কি করে সৎমা গরম জল ঢেলে দিয়েছিল, কেমন করে রাণী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল, বনের লতাপাতার ঔষুধ দিয়ে কি করে হরিণ রাণীকে ভাল করে তুলল এসব কিছুই বাদ গেল না। রাজা যতই শোনেন — ততই অবাক হয়ে যান। হরিণের কথা শেষ হলে রাজা এবার রাণীকে দেখতে চাইলেন। হরিণ আর কি করে! কাজেই, রাণীকে দেখাল। রাজা রাণীকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু এবারও হরিণ রাণীকে দিতে চাইল না। অগত্যা রাজা হরিণের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন, মাইরুংতুইয়ের রক্তে রাণীকে চান করাবেন। হরিণের তখন আর কোন আপত্তি রইল না। রাণীকে রাজার সঙ্গে রাজবাড়ীতে যেতে দিল।

রাজা শিকার থেকে ফিরে এলেন। শিকারে গিয়ে যা ঘটেছিল তার বিন্দু বিসর্গও মাইরুংকে জানালেন না। যেন তিনি কিছুই জানেন না এমনি ভান করে রইলেন। একদিন রাজা মাইরুংতুইকে ডেকে বললেন — "রাণী, আমার অনেকদিনের সাধ তোমার সঙ্গে নদীতে গিয়ে চান করি।" রাজার কথায় মাইরুংতুই আহ্লাদে আটখানা। তাহলে তো দেখছি সবই ঠিক আছে। রাজা কিছুই বোঝাতে পারেন নি। তাড়াতাড়ি চানের পোষাক নিয়ে সে তৈরী হয়ে গেল। যাওয়ার সময় রাজা কোমরে বেঁধে খুব ধারাল একটা তলোয়ার নিলেন। তা' দেখে মাইরুং অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।— "মহারাজ চান করতে যাচ্ছেন, তলোয়ার দিয়ে কি হবে? রাজা বললেন— "পথে যদি বাঘ ভল্লুক আসে তো তলোয়ার দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলব। দু'জনে নদীর ঘাটে চান করতে গেলেন। চান করতে করতে এক সময় রাজা বললেন "দেখি রাণী এদিকে এস দেখি, তোমার পিঠটা একটু ঘষে দিই।" রাণী আনন্দের সঙ্গে রাজার দিকে পিঠটা এগিয়ে দিল। সুযোগ বুঝে রাজা তলোয়ারের এক কোপে মাইরুংকে দু'খান করে ফেললেন। এবার মাইরুংতুই এর রক্তে ছিপিংতুইকে চান করালেন। মাইরুং এর মাংস কেটে কিছুটা শেয়াল কুকুরকে খাওয়ালেন বাকিটা হাঁড়িতে পুরে রেখে দিলেন। রক্ত দিয়ে চান করিয়ে, গয়না গাটি পরিয়ে ছিপিংকে আবার রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন। রাজ্যের লোকেরা তাদের রাণীকে ফিরে পেয়ে খুবই খুশি হল।

দু'একদিন পরেই রাজা রাণীকে বললেন— "তোমার তো ছেলে হয়েছে। এবার এ উপলক্ষে একটা উৎসব করা যাক। তোমার সৎমাকে এসে নাতির মুখ দেখতে খবর পাঠিয়ে দাও।" লোক পাঠিয়ে সৎমার কাছে খবর পাঠানো হল। মেয়ের ঘরে নাতি হয়েছে। শুনে মাইরুং এর মা সেদিনই রাজবাড়ীর দিকে রওনা হল। রাজবাড়ীতে এসে সৎমা নাতির মুখ দেখবে তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে নাতি কোথায়? দেখতে কেমন হয়েছে? এসব কথা। দাস দাসীরা মুচকি হেসে বলছে, 'এতো আর যার তার ছেলে নয়! এ হচ্ছে রাজার ছেলে। যখন তখন কি ঘর থেকে বের করা যায়? অপেক্ষা কর, সময় হলে আপনি দেখবে।" এদিকে কি হল একটা ব্যাঙের পায়ে ঘুংগুর

বেধে ঘরের ভেতর ছেড়ে দেওয়া হল। মাইরুং এর মা যেমনি নাতিকে দেখতে চায় অমনি ব্যাঙটাকে একজন লোক কাঠি দিয়ে নাড়া দেয়, ব্যাঙও নেচে উঠে। আর তখনই দাস দাসীরা বলে উঠে— "ওই যে শোন তোমার নাতি হাঁটছে।" এভাবে যে যার মত ওর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে লাগল। খাবার সময় হল। রাঁধুনে ঠাকুর রাণীর মাকে এবং রাজার শালাকে তাড়াতাড়ি এনে খেতে দিল। ভাল ভাল খাবার পেয়ে মা ছেলে মনের আনন্দে খেতে লাগল। মাংস খেতে গিয়ে এক সময় ছেলেটি মাকে বলে উঠল "মা মাংসের মধ্যে যেন দিদির গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।" মা বলল দূর বোকা, রাজবাড়ীতে কি এসব হয়? এইতো খানিক আগে তোর দিদিকে কথাবার্ত্তা বলতে শুনে এলাম। ঘরে বসে ছেলে নিয়ে খেলা করছে।

খুব খাওয়া-দাওয়া হল। এবার মাইরুং এর মা ও তার ভাই গাঁয়ে ফিরে যাবে। যাওয়ার সময় একজন দাসী এসে খুব বড় একটা হাঁড়ি ওদের হাতে তুলে দিল। হাঁড়িটার মুখ ভাল করে কাপড় দিয়ে বাঁধা। আর বলে দিল— "এতে সন্দেশ আছে। বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে খেতে দিও।" অন্য একজন এনে দিল মুখ বাঁধা একটি শুকনো লাউয়ের খোলা। বলে দিল— "অনেক দূর যাবে। তাই মেয়ে এতে ঠান্ডা জল দিয়ে দিয়েছে। পথে জল তেষ্টা পেলে খাবে। এবার মা ও ছেলে ধীর পায়ে গাঁয়ের পথে পা বাড়াল। এযাত্রা মেয়ে আর নাতির মুখ দেখা হল না। থাকগে, আবার এলে দেখা হবে ঠিকই। ওরা গাঁয়ের পথে চলছে। পথে কে একজন ডেকে জিজ্ঞাসা করল— 'ও দিদি তোমার মেয়ের মাংস কেমন খেলে? ছেলেটি তখন মাকে বলছে—"কেমন মা, আমিতো তখনই বলেছিলাম, দিদির মাংসই আমরা খাচ্ছি!" মা রেগে দিয়ে ছেলেকে বলল 'দুর বোকা রাজবাড়ীতে কখনও এসব হয় না। দুদিন পরেইতো আমরা সবাই আসছি। তখন ঠিক তোর দিদিকে দেখবি।" ছেলের কথায় কান না দিয়ে মা আপন মনে পথ চলতে লাগল। অনেকটা পথ হেঁটেছে, রোদটাও ভারী চড়া। ক্লান্ত হয়ে মা ছেলে একটা গাছের ছায়ায় বসল। খুব তেষ্টা পেয়েছে। লাউয়ের খোলা থেকে একটু জল খাওয়া যাক। যেই মা লাউয়ের খোলাটা খুলছে, আর যায় কোথায়! অমনি কতগুলো মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে ওদের কামড়াতে সুরু করল। মৌমাছির কামড়ে মা ছেলে আধমরা হয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ী পৌঁছল।

বাড়ীতে পৌঁছতেই পাড়া পশীরা সবাই এসে মাইরুং এর মাকে ঘিরে ধরল। সবাই বলতে লাগল— "তোমার মেয়ের জামাই এক হাঁড়ি সন্দেশ পাঠিয়েছে। তা খেতে খুবই ভাল হবে। এক্ষুণি আমাদের খেতে দিতে হবে।" মাইরুং এর মা সন্দেশ দেবার জন্য পাতিলের ভেতর হাত দিলে। কিন্তু সন্দেশের মত হাতে যেন কিছু ঠেকছেনা! অন্য কিছু যেন মনে হচ্ছে! হাত দিয়ে হাঁড়ির ভেতর থেকে বাইরে এনে দেখল, সন্দেশ কোথায়? এযে অতি আদুরে মেয়ে মাইরুং এর কাটা মাথা! মেয়ের কাটা মাথা দেখে মা মুর্চ্ছা গেল। পাড়ার লোকেরা যে যার ভয়ে পালিয়ে গেল। মুর্চ্ছা থেকে মাইরুং এর মা আর কোনদিন উঠেনি ❑

অজগর সাপের গল্প

দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছঘরের গাঁয়ের এক 'অচাই' (পুরোহিত)। সংসারে তার শুধু দুটি মেয়ে— আর কেউ নেই। মেয়ে দুটি ছেলেবেলাতেই মা হারিয়েছে। ঘরে বিমাতা এলে পাছে মেয়েদের যন্ত্রনা দেয়, ওদের কষ্ট হয়— এই ভেবে 'অচাই' আর বিয়ে থা করেনি। ঘর গেরস্থালীর যাবতীয় কাজকর্ম 'অচাই' নিজের হাতেই করে। এভাবেই চলছে 'অচাই' এর দিন।

মেয়েরা বড় হয়েছে। বুকে 'রিছা' বেঁধেছে। জুমের কাজকর্ম এখন মেয়েরাই করে। অচাইকে আর আগের মত কাজ করতে হয় না। তাই সে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মেয়ে দুটি জুমে যাবার সময় দুপুরে খাবার জন্য আয়দুল (ভাতের মোচা বা ঢেলা) নিয়ে যায়। ওদের জুমে 'গায়ারিঙ' (জুমে বিশ্রাম করার জন্য অথবা পাহারা দেওয়ার জন্য টংঘর) নেই। ঝড়- বাদল এলে ওরা দাঁড়াতে পারেনা; আয়দুলগুলোও ভিজে যায়। খেতে

পারে না। একদিন এমনি ঝড় বাদলের সময় বড়বোন ছোটবোনকে বলছে— 'এ গাঁয়ের সবার জুমেই গায়ারিঙ রয়েছে— নেই শুধু আমাদের জুমে। একটা গায়ারিঙ বানিয়ে দেয়— তা সে দেবতা, মানুষ, সাপ, বাঘ, ভালুক যেই হোক না কেন— আমি ওকে বিয়ে করব। এসব বলাবলি করতে করতে ওরা সেদিন বাড়ী ফিরে এল।

বনদেবী ওদের কথাবার্ত্তা শুনলেন। সে রাতেই তিনি মেয়েদের জুমে প্রকাণ্ড একটা গায়ারিঙ তুলে দিলেন।

পরদিন রাত ভোর হতেই দুবোন জুমে যাচ্ছে। জুমের কাছে থেকেই ছোটবোন বড়বোনকে বলছে—"দেখছিস দিদি, কে যেন জুমে একটা টংঘর তুলে দিয়েছে।" বড়বোনের বিশ্বাস হলনা। সে বলল— "আমাদের জন্য এতটুকুন কে করবে বোন?" একসময় দু'বোন জুমে পৌঁছে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো, আমাদের জুমেই দেখছি সুন্দর একটা গায়ারিঙ দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই দৌড়ে গায়ারিঙ এর উপর উঠে এল। গায়ারিঙ এর উপরেই মস্ত এক অজগর লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। ওদের দেখেই অজগরটা গড়াতে গড়াতে গায়ারিঙ থেকে নেমে গেল। ওরা ভাবল, এ অজগরটাই হয়ত ঘর তুলে দিয়েছে। সেদিন থেকে বড়বোন প্রতিজ্ঞামত অজগর সাপটাকেই মনে মনে পতি বলে বরণ করে নিল।

দু'তিন দিন পর— একদিন দুপুরবেলা খাবারের সময় বড়বোন ছোটবোনকে বলছে— 'বোন, তোর জামাইবাবুকে ডাকনা— আমাদের সাথে খাবে।' বড়বোনের কথা মত ছোটবোনও 'নগুল' এ (বারান্দা) দাঁড়িয়ে জামাইবাবুকে ডাকল — 'জামাইবাবু, ওগো জামাইবাবু, ভাত খাবে তো এস! ডাক শেষ না হতেই বন জঙ্গল দুমড়িয়ে অজগরটা এসে হাজির হল। ছোটবোন ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইল। বড়বোন নিজের খাবারটুকু অজগরের সামনে এগিয়ে দিতেই অজগরটা খেয়েদেয়ে চলে গেল। এভাবে রোজ দুপুরে খাবার সময় হলে ছোটবোন জামাইবাবুকে গলা চড়িয়ে ডাক দেয় — অজগরটাও এসে খেয়ে যায়। অজগর খেয়ে গেলে যা কিছু থাকে সবটুকুই ছোটবোনকে দিয়ে দেয় দিদি। ও নিজে কিছুই খায় না — না খেয়েই থাকে। এভাবে রোজ না খেয়ে খেয়ে দিন দিন কাহিল হতে লাগল বড় মেয়েটি। মেয়ে দিন দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে দেখে বুড়ো অচাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কোন রোগ শোক হল কিনা কে জানে! কম খেতেও তো দেখছি না। একদিন অচাই তার বড় মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করল — "আচ্ছা মা, তুই দিন দিন এমন কাহিল হয়ে যাচ্ছিস কেন? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?" মেয়েও বাবার কথার উত্তর দেয় — "না বাবা, আমার কোন অসুখ বিসুখ করেনি; আমি তো আগের মতই আছি।" অচাই আর কিছু বলল না।

সেদিন ছোট মেয়েটি জুমে গেল না। বড় মেয়েটিকে তাই একাই যেতে হল। একা পেয়ে অচাই ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল "তা মা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোর দিদি দিন দিন এমন কাহিল হয়ে যাচ্ছে কেন? কোন অসুখ বিসুখ হতেও তো দেখছি না।

ভেতরে কোন রহস্য থাকলে আমাকে খুলে বল। আমি যা' হোক একটা ব্যবস্থা করতে পারি।'' বাবা জিজ্ঞাসা করতেই ছোট মেয়ে বাবাকে সবকিছু খুলে বলল। সে বলতে লাগল — 'একদিন আমরা জুমে কাজ করছি, এমন সময় আকাশ কালো করে খুব ঝড় বৃষ্টি এল। ঝড় বাদলের দাপটে দু'বোন আর তিষ্টোতে পারছিলাম না। এমন সময় দিদি চীৎকার করে বলে উঠল — ''আজ এমনি দিনে দেবতা, মানুষ, সাপ, বাঘ, ভালুক, যে হোক, যে আমাদের জুমে একটা গায়রিঙ তুলে দেবে, তাকেই আমি স্বামী বলে বরণ করব।'' সেদিন রাতে একটা অজগর সাপ এসে সত্যি সত্যিই আমাদের জুমে প্রকাণ্ড একটা গায়রিঙ তুলে দিলে। প্রতিজ্ঞামত দিদিও তাকে স্বামী বলে মেনে নিল। সেদিন থেকে রোজ দুপুরে খাবার সময় হলে দিদি অজগরটাকে ডাকতে বলে। আমিও নগুল এ দাঁড়িয়ে ডাকতেই অজগরটা টংঘরের উপর উঠে আসে। অজগর এলে দিদি নিজের ভাগের মায়দুলগুলো ওর সামনে এগিয়ে দেয়। দিদি না খেয়েই থাকে। রোজ দুপুরবেলা না খেতে পেয়েই দিদি হয়ত কাহিল হয়ে যাচ্ছে। এসব শুনে অচাইয়ের খুব রাগ হল। ''আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি'' বলে বুড়ো সুযোগ খুঁজতে লাগল।

সুযোগও পেয়ে গেল। সেদিন বড়মেয়েটি পড়শীর জুমে দিন বদলীতে (য়াগুল) গিয়েছে। দুপুরবেলা অচাই টংঘরে উঠে এসে ছোটমেয়েকে বলল — ''মা, রোজ তুই যেমন করে জামাইবাবুকে ডাকিস, আজও তেমনি ডাক দিকিনি। এদিকে অচাই একটা ধারাল দা নিয়ে দরজার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। মেয়েটি ডাকামাত্রই অজগর বন জঙ্গল কাঁপিয়ে এসে হাজির হল। অন্যদিনের মত অজগর দরজা দিয়ে গায়রিঙ-এ ঢুকতে যেতেই অচাই হাতের ধারাল দা দিয়ে এক কোপেই অজগরের গলাটা দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর ছেঁচে ছুলে এনে মেয়েকে বলল — 'নে এবার এটাকে ভাল করে রেঁধে রাখ দিকিনি। তোর দিদি এলে খেতে দিবি।'' অজগরের মাথা আর হাড়গুলো জুম থেকে দূরে একটা ঝরণায় গভীর জলে ফেলে দিয়ে এল। টংঘরটাকেও ভাল করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখল।

ওদিকে পড়শীর জুমে কাজ করছিল অজগর বৌ। আচমকা তার গলার মালাটা খসে গেল মালাগুলো কুড়িয়ে নিলে আবার গাঁথা যাবে ভেবে কুড়াতে গেল। না — একটাও পেল না। তাইতো। মালাগুলো পেলাম না কেন? খুব চিন্তা হল ওর। শরীরটাই বা এমন লাগছে কেন? থেকে থেকে চমকে উঠছে ও। কাজকর্মেও আর মন লাগছে না। হঠাৎ কি কে জানে! বাড়ী ফিরে এল তাড়াতাড়ি। ঘরে আসতেই ছোটবোন বলল দিদি, ওখানে তোমার খাবার রয়েছে, খেয়ে নাও।'

গায়রিঙ এর এখানে ওখানে তখনও ছিটেফোঁটা রক্ত লেগেছিল। ধোয়া হলেও খুব ভাল করে ধোয়া হয়নি। ওগুলো দেখে বড়বোন ছোটবোনকে জিজ্ঞাসা করছে — 'বোন, গায়রিঙের এখানে ওখানে ছিটাফোঁটা রক্ত কিসের? ছোটবোন বলল — ''বাবা একটা কচ্ছপ কাটছিল, হয়ত তারই রক্ত লেগে আছে। বড়বোন আর কিছু বলল না। চুপচাপ

নিয়ে খেতে বসল, কিন্তু কিছুই খেতে পারল না। মনে খুবই সন্দেহ হতে লাগল। ওদিকে মালাটাও ছিঁড়ে গেল, গায়রিঙেও রক্ত লেগে আছে এখানে ওখানে - ঘরটা অজগর সাপের গন্ধেই ভরে আছে।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে যাবে হঠাৎ মনে পড়ল, সত্যিই তো আজ যে অজগরকে খাওয়ানো হয়নি। তাই ছোটবোনকে বলল — "বোন তার সাথে দেখা হওয়া অব্দি কোনদিন তাকে না খাইয়ে খাইনি। আজও ওকে ডাক দিকিনি। আগে ওকে খাইয়ে নি, পরে আমি খাব।" বড়বোন যাতে না বুঝতে পারে — ছোটবোন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে রইল। তাই বড়বোন বলতেই ছোটবোনও জামাইবাবুকে ডাকতে লাগল। কিন্তু সেদিন আর কেউ এল না। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

অজগর এল না বলে অজগর বৌ খুব কাঁদল কতক্ষণ। ছোটবোনের হাত ধরেও বলল — "চল বোন, তোর জামাইবাবু কোথায় আছে খুঁজে দেখি। রোজ খেতে আসে, আজ এল না কেন! ওর দেখা না পেয়ে আমিও আর ফিরছি না। দু'বোন সারাটা বন আতিপাঁতি করে খুঁজে দেখল — না; কোথাও তার দেখা পেল না। ডেকেও দেখল খুব করে। কিন্তু সাড়া পেল না একবারও।

এদিক ওদিক খুঁজে পেতে বেলা শেষে ওরা ঝরণার পাশে এসে দাঁড়াল। এ ঝরণাতেই অজগরের মাথাটা ফেলেছিল অচাই। ঝর্ণার দুধারে ফুটে রয়েছে অজস্র 'খুম্পুই' (দোলন চাঁপা)। এত ফুল! লোভ সামলাতে পারল না ছোটবোন। একটা ফুল দিয়ে খোঁপায় গুঁজতেই ফুলটা শুকিয়ে গেল। আবার গুঁজে দেখল — শুকিয়ে গেল। এভাবে বার কয়েক ছোটবোন ফুল পরে দেখল। কিন্তু বার বারই শুকিয়ে যাচ্ছে ফুলগুলো। সে অবাক হয়ে দিদিকে ডেকে বলল — "দেখ দিদি, আমি ফুল পরা মাত্রই ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। কেন যে এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। বড়বোনও খুব অবাক হয়ে গেল। জীবনে কখনো এভাবে ফুল শুকিয়ে যেতে দেখেনি ও। দেখা যাক, সেও একটা ফুল তুলে মাথায় গুঁজল। ও-র মাথার ফুলটা কিন্তু শুকাল না। এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন রহস্য রয়েছে। ভারী সন্দেহ হল অজগর সাপের স্ত্রীর মনে। এ অজগর সাপের কারণেই হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। সে ছোটবোনকে বলল — "বোন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস, আমি জলে নামছি।" এই বলে সে ঝর্ণার জলে নেমে সুর করে গেয়ে উঠল —

ফুটতে থেকো দোলন চাঁপা, ফুসতে থাকিস জল।

ঝর্ণা বয়ে কোথায় যাচ্ছিস? আমার নিয়ে চল।।

গানের সাথে সাথে ঝর্ণার পাশে দোলন চাঁপা গাছের অফুটন্ত ফুলগুলো একে একে ফুটতে লাগল। ওদিকে ঝর্ণার জল ক্রমশ ফুসতে লাগল। পায়ের গোড়ালিতে পড়ে থাকা জল মেয়েটির কোমর ছাপিয়ে উঠল। আবারও গেয়ে চলল অজগর বৌ। ঝর্ণার জল এবার

গলা ছাপিয়ে উঠে এল। তা দেখে ছোটবোনের খুব ভয় হল। সে চীৎকার দিয়ে দিদিকে বলে উঠল — "উঠে এস দিদি। আমি কার সাথে থাকব বল?"

বড়বোন জলে দাঁড়িয়েই উত্তর করল — "আমাকে আর ফিরে আসতে বলিস না বোন। তোর জামাইবাবু যেখানে আছে, আমি সেখানেই যাচ্ছি।" বড়বোন ছোটবোনকে খুব মমতা করত। তাই ডুবে যাওয়ার আগে ছোটকে বলে গেল। "বোন, তোকে দু'টো কথা বলে যাচ্ছি। তুই সেভাবে চলিস্, তোর ভাল হবে। এখান থেকে তুই সোজাসুজি এগিয়ে যাস্। যেতে যেতে একসময় সাত পথের মোড়ে গিয়ে পৌঁছে যাবি। সাত পথের বাঁকেই আছে এক বিরাট বটগাছ। বটগাছের সাতটা ডাল — সাতদিকে চলে গেছে। সে বটের সাতটা ডাল যেখান থেকে উঠেছে — ঠিক সেখানেই রয়েছে একটা সোনার চরকা। সে বটগাছে চড়ে সোনার চরকা দিয়ে সূতো কাটতে থাকিস্, সাথে সাথে সুর করে গাইতে থাকিস্ —

রাজার রাণী না হই যদি, আমি নারী নই।
সাত সন্তানের মা না হলে আমি নারী নই।।

কথা শেষ হতেই অজগর বৌ জলের নীচে তলিয়ে গেল! ডুবে যেতেই জলের নীচে প্রকাণ্ড এক রাজবাড়ী দেখতে পেল। বাড়ীর ফটকে মানুষের রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়ে আছে ওর স্বামী — ওকে এগিয়ে নিতে এসেছে। দু'জন দু'জনকে পেয়ে ভারী খুশী হল। অজগর স্বামী স্ত্রীর কাছে সবকিছু খুলে বলল। কি করে ছোটবোন ওকে ডেকেছে, অচাই কি করে ওকে কেটে ফেলল কিছুই বাদ গেলনা। ছোটবোন মিছিমিছি ওকে ডেকেছিল — তাই ওর ওপর খুব রাগ হয়েছিল। আর এজন্যই ওর পরা খুম্পুইগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। তোমার ছোটবোন রাজার রাণী হবে — আর সাতটি সন্তানের মা হবে ঠিকই — কিন্তু ও সুখী হবে না দেখে নিও। বড়বোন ছোটবোনের হয়ে স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। স্ত্রীর কথায় স্বামীর মন প্রসন্ন হল। সে বলল — শুধুমাত্র তোমার জন্যই শেষ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারবে। সেদিন থেকে ওরা দুজনে জলপুরীতে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

ওদিকে ছোটবোন দিদির কথামত চলতে চলতে একসময় সাত পথের বাঁকে সাতডালা বটগাছের নীচে এসে পৌঁছল। সে বটগাছের সাতটা ডাল যে জায়গায় মিলেছে ওখানেই একটা চরকা ঝুলানো রয়েছে। মেয়েটি গাছে উঠে সোনার চরকা দিয়ে সূতো কাটতে লাগল — আর আপন মনে গাইতে লাগল। রাজার সিপাইরা শিকারে যাচ্ছিল সেপথে। ওরা দেখল, বটগাছের ওপর একটি মেয়ে চরকা কাটছে আর গাইছে। ব্যাপার কি, ওভাবে মেয়েটি গাইছে কেন! ওরা গাছের নীচে এসে মেয়েটিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। কিন্তু মেয়েটির মুখ থেকে একটি কথাও বেরোল না। সে আপন মনে চরকা কেটেই চলল।

রাজার সৈন্যগণ রাজধানীতে ফিরে গিয়ে এ খবর রাজাকে জানাল। সত্যি কি মিথ্যা রাজা নিজেই দেখতে এলেন সাত পথের বাঁকে। হ্যাঁ ঠিকইতো! সুন্দরী একটি মেয়ে

বটগাছের ওপর বসে চরকা কাটছে আর গান গাইছে। রাজাও মেয়েটিকে একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করলেন। এবারও মেয়েটি কোন কথার জবাব দিল না। কোন কথারই যখন জবাব দিচ্ছে না তখন বাধ্য হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — "সত্যি, সত্যি তুমি সাত সন্তানের মা হতে পারবে?" এবার মেয়েটি মুখ খুলল। সে বলল — আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, মহারাজ পারব বৈকি!" — "তাহলে তুমি গাছ থেকে নেমে এস, আমি তোমাকে রাণী করব" — রাজা বললেন। রাজার হুকুমে সঙ্গের লোকজনেরা রাজবাড়ীতে গিয়ে রাণীর পোষাক আষাক নিয়ে এল। গাছ থেকে নেমে এলে রাজা তাকে বিয়ে করে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন। এখন থেকে অচাইর ছোটমেয়ে হল রাজরাণী।

রাজা ছোটরাণীকে নিয়ে সুখেই আছেন। রাজার ছিল আরও সাত রাণী। সাত রাণীর কারো ঘরেই কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। তার জন্য রাজার মনে সুখ-শান্তি ছিল না। সব রাণীদের চেয়ে রাজা ছোট রাণীকে বেশী ভালবাসেন। তাই অন্য রাণীরা ছোটকে খুব হিংসা করত।

ছোটরাণীর ঘরে ছেলে হবে। এখবর শুনে রাজার মনে খুব আনন্দ হল। পাছে প্রসবকালে কোন অমঙ্গল হয় এ ভয়ে রাজা সবসময় ছোটরাণীর কাছাকাছি থাকেন। শুধু রাজ্যের কাজে মাঝে মাঝে দরবারে যান। রাজা যখন দরবারে বসেন তখনও রাণীর প্রসব বেদনা উঠতে পারে। তাঁকে খবর দেবারও হয়ত কেউ থাকবে না। তাই একটি লম্বা দড়ি অন্দরমহল থেকে দরবার পর্যন্ত ঝুলিয়ে বেঁধে রাখলেন। আর দরবারে যাবার সময় রোজ বলে যান — "ছোটরাণী আমি দরবারে যাচ্ছি। তোমার প্রসব বেদনা হলে এ দড়িটা ধরে টেনো। আমি চলে আসব।"

অন্য রাণীরাও এখবর জানল। ওরা সবাই এসে ছোটরাণীকে বলছে — "ছোট, তোর তো ছেলে হবে। তা সত্যি সত্যিই রাজা আসেন কিনা একবার দড়ি টেনে পরখ করে দেখনা।" ছোটরাণী কিছুতেই দড়ি টানতে রাজী হল না। সে বলল — "রাজা তো আমাকে শুধুমাত্র প্রসব বেদনা হলেই দড়ি টানতে বলেছেন। মিছামিছি দড়ি টানলে রাজা রেগে যাবেন। সত্যিই, এ আমি পারব না।" ছোটরাণী টানছে না দেখে রাণীদের মাঝেই একজন দড়ি টান দিল। যেই মাত্র দড়ি টানা — অমনি পড়ি কি মরি দৌড়ে এলেন রাজা। এসে দেখলেন, না — কিচ্ছু না। মিছামিছি কে দড়ি টেনেছে, ছোটরাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন। ছোটরাণী বলল — সত্যি কি মিথ্যা, রাজা আসেন কি না আসেন পরখ করে দেখতে রাণীদের মাঝে একজন দড়ি টেনেছে। রাজা খুব রেগে গেলেও কাউকে কিছু বললেন না — দরবারে ফিরে গেলেন আবার।

এখন থেকে রোজ — রাণীদের মাঝে কেউ না কেউ সবার চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি যখন তখন দড়ি টানতে লাগল। রাজাও দৌড়ে আসেন, আবার ফিরে যান। রাজা খুব বিরক্ত হলেন। এখন থেকে দড়ি টানলেও আর যাবেন না বলে ঠিক করলেন। দরবারের

কাজ ফেলে কত আর মিছামিছি দৌড়াবেন।

সত্যি সত্যিই যেদিন ছোটরাণীর প্রসব বেদনা হল — সেদিন বার বার দড়ি টানলেও রাজা এলেন না। নিরুপায় হয়ে ছোটরাণী অগত্যা সতীনদের কাছেই গিয়ে বলল। সতীনেরাও সুযোগ পেয়ে ছোটরাণীকে বলল — "তা তুইতো ঘরে প্রসব করতে পারবি না, অমঙ্গল হবে। নদীর পারে যেতে হবে তোকে। যাবার আগে চোখ দু'টো সাতনরী কাপড় দিয়ে বেঁদে দিতে হবে।" এই বলে সতীনেরা সবাই মিলে সাতনারী কাপড় দিয়ে ছোটরাণীর চোখ দুটো শক্ত করে বেঁধে নদীর পারে নিয়ে গেল। সেখানেই ছোটরাণীর ঘরে একটি মেয়ে হল। প্রসব হতে না হতেই কিন্তু সতীন রাণীরা মেয়েটিকে নদীর জলে ফেলে দিল। প্রসব বেদনায় অজ্ঞান হয়েছিল বলে ছোটরাণী কিছুই বলতে পারল না।

এভাবে ফি বছরেই এক এক করে ছোটরাণীর ঘরে একটি মেয়ে আর সাতটি ছেলে হল। হলে কি হবে — বার বারই সতীনেরা ছেলেমেয়েদের ভূমিষ্ট হলেই জলে ফেলে দেয়। ওদিকে জলের নীচে অজগর সাপের বৌ — ওদের মাসী রয়েছে। রাণীরা রাজার ছেলেমেয়েদের জলে ফেলে দিতেই মাসী ওদের হাত পেতে বুকে তুলে নিত। 'ওরা' মরত না। মাসীই ওদের লালন-পালন করছে। মাসীর কাছেই ওরা দিন দিন বড় হতে লাগল।

সন্তান প্রসবের সময় সাতনরী কাপড়ে বাঁধা থাকত ছোটরাণীর চোখ দু'টো। তার উপর প্রসব বেদনায় অজ্ঞান হয়ে থাকত বলে 'ছেলে হল কি মেয়ে হল', পাথর হল কি মানুষ' হল কিছুই বলতে পারত না। সম্বিত ফিরে এলে "ছেলে হল কি মেয়ে হল' দেখতে চাইলে সতীনেরা পাথর কুঁচি, বাঁশের টুকরো জড়ো করে এনে দেখাত। রাণীদের কাথায় দাসীরাও বার বার পাথরকুঁচি, বাঁশের টুকরোগুলোকেই দোলনায় রেখে দোলনা দোলানোর সুরে গান গাইত।

রাজবাড়ীতে সৃষ্টি ছাড়া
কাণ্ড কত শত;
রাণীর ঘরে রাজার ছেলে —
বাঁশের কঞ্চি পাথর কুঁচি যত।

বার বার রাজা ছেলেমেয়েদের দেখতে এসে দাসীর মুখে এ গান শুনে দাসীকে জিজ্ঞাসা করতেন — "তুই এগুলো কি গাইছিস্?" দাসী বলত — 'ছোটরাণীর ঘরে ছেলে হয়েছে — পাথর কুঁচি আর বাঁশের কঞ্চি। সে গানই গাইছি মহারাজ। রাজা লজ্জা পেয়ে ফিরে যেতেন।

রাজা খুব চিন্তিত হলেন। মানুষের ঘরে কি কখনও বাঁশের কঞ্চি আর পাথর কুঁচি হয়! ছোটরাণী নিশ্চয়ই রাক্ষসী, নয়তো ওর ঘরে পাথর কুঁচি আর বাঁশের কঞ্চি হবে কেন! ওকে ঘরে রাখলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হবে। যত শীগ্‌গীর সম্ভব ওকে তাড়িয়ে দিতে হবে। রাজা হুকুম করলেন — "ছোটরাণীর মাথা মুড়িয়ে ছাগল চরাতে পাঠিয়ে দাও আজই।" রাজার

হুকুমে ছোটরাণীকে ছাগল চরাতেই যেতে হল।

রাজ্যের লোকেরা নদীর ঘাটে জল আনতে যায়। কিন্তু জল আনতে পারে না। জল ভরতে গিয়ে কলসী জলে ডোবালেই কে যেন কলসীগুলো ফুটো করে দেয়। কিন্তু কারা যে করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাজ্যের লোকেরা জল ভরতে পারে না — তাই জলও খেতে পারে না। জল খেতে না পেয়ে প্রজারা সবাই মিলে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। রাজা নিজেই নদীর ঘাটে দেখতে এলেন। দূরে — নদীর বুকে সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছোট্ট একটি নৌকো নিয়ে খেলা করতে দেখলেন রাজা। নৌকা নিয়ে ওরা একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। কাউকে না পেয়ে, ওরাই কলসী ফুটো করছে বলে ভাবলেন রাজা। ওদের ধরতে গেলেন। কিন্তু পেরে উঠলেন না। ধরতে গেলেই নৌকো নিয়ে জলে ডুবে যায় ওরা। বার বার নাকানি চুবানি খেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন রাজা। এবার নদীর পারে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের পরিচয় জানতে চাইলেন। মাসী যে রকম শিখিয়ে দিয়েছিল ওরাও ঠিক তেমনি বলল— "নদীর পারে দাঁড়িয়ে যে মেয়েলোক নিজের স্তন দিয়ে আমাদের মুখে এনে ফেলতে পারবে, আমাদের পেট ভরাতে পারবে— তিনিই আমাদের মা।"

রাজার আদেশে রাজ্যের সব মেয়েরা একে একে এসে স্তন দিয়ে গেল। ছেলেদের পেট ভরাতো দূরের কথা, একবিন্দু দুধও গিয়ে মুখে পড়ল না। কি আর করা যায়! স্তন দিয়ে পরখ করে দেখেনি এমন একজন মেয়ে লোকও আর রাজ্যে নেই। এ অবস্থায় কি করা উচিত রাজা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় বিরিদিয়ারা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা, উসকু খুসকু চুল, রোগা মত একজন মেয়েলোককে নিয়ে এল। সেই শুধু স্তন দিয়ে দেখেনি। রাজার হুকুম, তাকে স্তন দিয়ে দেখতে হবে। সে নদীর পারে দাঁড়িয়ে স্তন দিতেই ছেলেদের নাকে মুখে গিয়ে পড়ল। মায়ের বুকের দুধে ওদের পেট ভরে গেল। ছেলেমেয়েরা মাকে চিনতে পেরে দৌড়ে এসে মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়ল। রাজা খুব অবাক হয়ে ছেলেমেয়েদের পরিচয় জানতে চাইলেন। জলপুরীর মাসী যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল— ছেলেমেয়েরাও ওদের জন্ম থেকে শুরু করে সব বৃত্তান্ত রাজাকে শোনাল। লজ্জায় রাজা নীচের দিকে মুখ করে রইলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাণীর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

এবার সাজা দেবার পালা। রাজার আদেশে খুব বড় একটা গর্ত্ত খোড়া হল। নীচে বিছিয়ে দেওয়া হল একতাল কাঁটা। ছোট রাণীকে যে সাত রাণী হিংসা করত ওদের সবাইকে এক সাথে ওই গর্ত্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হল। সাত রাণী নিজেদের হিংসার ফল পেল।

এখন থেকে রাজা, ছোট রাণী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন ❑

চাঁদের ছেলে

অনেক পুরানো দিনে দূর পাহাড়ের কোলে— কোন এক গাঁয়ে এক জুম চাষী আর তার বৌ জুম চাষ করে দিন গুজরাত। ওদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না।

চাষীর ছিল একটি বোন! বোনটি যখন গর্ভবতী তখনি একদিন—জুমে কাজ করতে গেলে বোনের বরটি সাপের ছোঁবলে মরে গেল। এর কিছুদিন পরে বোনটিও মরল আঁতুর ঘরে। রেখে গেল কচি একটি শিশুকে। বাপ মা নেই। ছোট মেয়েটি তখন থেকে মামা মামীর কাছেই বড় হতে লাগল। নিঃসন্তান চাষা আর চাষীবৌ দু'জনেই মেয়েটিকে খুব আদর করত। মেয়েটিও মামা-মামীকেই মা বাবা বলে ডাকাত। মেয়েটির নাম ছিল কুফুরতি বা শুভ্রা।

বড় হাওয়ার সাথে সাথে কুফুরতির রূপ লাবন্য যেন ঠিরে পড়তে লাগল। কাজে-

কর্মেও তার জুরি নেই। ঘর গেরস্থালীর সকল কাজেই কুফুর তার মামা মামিকে সাহায্য করে থাকে। এমন আদুরে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে পারবেনা চাষী বৌ। ওদের যে আর কেউ নেই।

রোজ আকাশে চাঁদ উঠে অস্ত যায়। চাঁদ উঠলেই কুফুরতি চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। কি সুন্দর চাঁদ। চাঁদের দিকে তাকাতেই চাঁদের ভিতর থেকে কে একজন সুন্দর পুরুষ যেন কুফুরতিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। পুরুষটি খুব সুন্দর। এমন সুন্দর মানুষ কুফুরতি জীবনে কখনও দেখেনি! কুফুরতির সাথে ওর নীরবে কি যেন কথা হয়। কুফুরতি মনে মনে ওকে ভালবেসেছে। লোকটি আর কেউ নয়— স্বয়ং চন্দ্রমাদেব।

বসন্ত কাল। এক নিশুতি রাত। গাঁয়ের কেউ জেগে নেই মামা মামীও অঝোর ঘুমুচ্ছে। কুফুরতিও ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কুফুর স্বপ্ন দেখছে চন্দ্রমাদেব এসে যেন ওকে বলছে— "কুফুর আমি এসেছি, আমাকে গ্রহণ করো।" সারারাত চন্দ্রমাদেব যেন কুফুরের পাশেই জেগে রইল।

এমনি করেই সারারাত কেটে গেল। কখন ভোর হয়েছে কুফুর বলতেই পারেনা। ঘুম ভাঙ্গালো তার মামীর ডাকে। ঘুম থেকে উঠার পর রাতের স্বপ্নের কথাই বার বার কুফুরের মনে হতে লাগল। একবার ও ভাবছে, এ শুধু স্বপ্নই— আর কিছু নয়। আবার মনে হচ্ছে, স্বপ্নই যদি হবে তবে চন্দ্রমাদেবের ছোঁয়ার রেশটুকু সারা শরীরে লেগে থাকবে কেন! আজ রাতেও যদি আসে তাহলে ঠিক বুঝতে পারব। ঘুম থেকে উঠে কুফুর তখনকার মত কাজে চলে গেল।

পরদিন রাতে কুফুর ঘুমাল না, জেগে রইল। আজও চন্দ্রমাদেব আসেন কিনা দেখতে হবে। নিশুতি রাতে আজও চন্দ্রমাদেব এলেন। কুফুর ভালবাসার মানুষটিকে বসতে ঠাঁই করে দিল। সেদিন থেকে রোজ নিশুতি রাতে চন্দ্রমাদেব গোপনে এসে কুফুরের সাথে মিলিত হতে লাগলেন। ওদের এই মিলনের কথা কেউ জানতে পেল না। কুফুরও কাউকে কিছু বলল না।

দিন যতই যেতে লাগল কুফুরের শরীরেও নানারকম পরিবর্ত্তন হতে লাগল। কুফুর সন্তান সম্ভবা হয়েছে। কুফুরের শারিরীক পরিবর্ত্তন মামা-মামীর চোখ এড়াল না। কুফুর নিজে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। একদিন কুফুরের মামী ওকে গোপনে জিজ্ঞাসা করল—, 'কুফুর বল দেখিমা, তুই কাকে ভালবেসেছিস? তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তুই মা হতে যাচ্ছিস। তুই যার নাম বলবি, তার সাথেই তোর বিয়ে দেব।" কুফু মামীর কাছে সব কিছুই খুলে বলল। সে আরও জানাল, চন্দ্রমাদেবকেই তার সবচেয়ে পছন্দ তাকেই সে বিয়ে করবে। মেয়ের কথা শুনে মামা-মামী দু'জনেই অবাক। চন্দ্রমাদেব হলেন দেবতা— মানুষের নাগালের বাইরে। ওর সঙ্গে মানুষের কি করে বিয়ে হবে! যা কোন দিন হবার নয়, সে কথাই কিনা মেয়ে বলছে! খুব করে জিজ্ঞেস করেও কুফুরের কাছ থেকে আর কারো নাম জানা গেল না।

কথাটা গোপন রইল না। একান সেকান করে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার কানেই গেল। জুমে কাজ করতে গেলে— ঘাটে জল আনতে গেলে এক কথাই সবার মুখে। লজ্জায় মামা মামীর মুখ দেখাবার উপায় রইল না।

গাঁয়ের সর্দার ও বড়রা একদিন মিলিত হয়ে কুফুরের মামাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করল। মামা বেচারা কুফুরের কাছে যেমনটা শুনেছিল, সবই বলে শুনাল। কিন্তু কথাটাকে সবাই আজগুবি বলেই ধরে নিল। মানুষের সাথে কি দেবতা চন্দ্রমাদেবের মিলন সম্ভব। এ কখনো হতে পারে না। গাঁয়ের লোকেরা তাই কুফুরের মামাকে বলল— "তোমার ঘরেত বাপু আর কোন পুরুষ মানুষ নেই। কুফুরও আর কারো নাম বলছে না। কাজেই একাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করেনি।" লজ্জায় সরমে কুফুরের মামা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। যাকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে— যাকে সে নিজের মেয়ে বলেই জানে তাকে নিয়েই না আজ একথা। কথাটা কুফুরও শুনল। কিন্তু সে আর নতুন করে কি বলবে। মামার জন্য শুধু চোখের জল ফেলল।

সবদিক বিচার করে গাঁয়ের লোকেরা কুফুরকে গাঁ থেকে বের করে দিতে হবে বলে তার মামাকে হুকুম করল। ওদের এ হুকুম না মানলে গাঁয়ের কেউ ওদের সংগে খাওয়া দাওয়া করবে না বলেও জানিয়ে দিল। গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে যাওয়ারতো উপায় নেই। তাই কুফুরের মামাকেও এ ব্যবস্থা মাথা পেতে নিতে হল।

কুফুরদের গাঁ থেকে খানিক দূরেই ছিল একটা ফেলে যাওয়া জুম। একদিন কুফুরের মামা ওকে সেখানেই একটা পুরানো গায়রিং-এ রেখে এল। এখন থেকে সুরু হল কুফুরের একা থাকার জীবন। মামা রেখে যাওয়ার পর সারাদিন কুফুর গায়ারিঙ-এর বারান্দায় বসে খুব করে কাঁদল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল বলতেই পারে না। সন্ধ্যা নামতেই চন্দ্রমাদেব নেমে এলেন সেই ফেলে যাওয়া জুমে কুফুরের পাশে। কুফুর কেঁদে কেঁদে চন্দ্রমাদেবের কাছে সব কিছু জানাল। চন্দ্রমাদেবও ওকে অনেক কিছু বলে সান্ত্বনা দিল। তিনি বললেন— "ভয় করনা কুফুর, দূর হতে সব সময় আমি তোমাকে দেখব। বনের বাঘ ভালুক তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি এবং তোমার ছেলের মধ্যদিয়ে কোন এক দেবতার পূজার প্রচার হবে বলে তোমাকে এতটুকুন কষ্ট করতে হচ্ছে। শীগগীরই তোমার কোলে আমার ছেলে আসবে। ওর দ্বারাই তোমার সব দুঃখ দূর হবে। তুমি যখনি ডাকবে তক্ষুনি আমি ছুটে আসব।" এই বলে চন্দ্রমাদেব সেদিনকার মত বিদায় হলেন।

গায়রিঙের পাশেই কিছুটা জায়গাতে কুফুর জুম চাষ করতে লাগল। মামা মামীও কখন কখন এসে জুমের কাজে সাহায্য করে থাকে। এ জুমের ফসল দিয়েই ওর একজনের চলে যায়। দিনভর জুমের ও অন্যান্য ঘর গেরস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকে ও। সন্ধ্যা হলেই গায়রিঙ আলো করে নেমে আসেন চন্দ্রমাদেব। দু'জনে রাতভর গল্প করে। এভাবেই কুফুরের দিন যাচ্ছে।

দিন দশমাস পূর্ণ হলে কুফুরের ঘরে একটি সন্তান হল। সন্তানটি কিন্তু মানুষ হলনা, হল একটি সোনাব্যাঙ। নাতি দেখেতো মামা-মামীর চোখ ছানাবড়া। মানুষের ঘরে কি কখনো ব্যাঙ হয়? কুফুর কিন্তু ওকে এতটুকু অনাদর করল না। সাপ হোক ব্যঙ হোক নিজের পেটের সন্তান, ফেলবে কোথায়? সোনাব্যাঙ ছেলেই ওর নয়নের মণি। ওকেই কুফুর বুকে নিয়ে আদর করে। দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়, ঘুম পাড়ানি গান গায়।

ভেবেছিলাম, চাঁদের ছেলে চাঁদের মত হবে,
সোনামণির সারা গায়ে জ্যোৎস্না মাখা রবে।
সোনাব্যাঙের রূপ ধরে যে এল সোনামণি।
নিদ্রাদেবীর যত ঘুম সোণায় দেবে জানি।

চাঁদের ছেলে বলে কুফুর ওর নাম রাখল চন্দ্রকুমার। মায়ের কোলে চন্দ্রকুমার দিন দিন বড় হতে লাগল। ব্যাঙ হলে কি হবে— চন্দ্রকুমারের কিন্তু খুব বুদ্ধি। মাকে একথা, ওকথা হামেশাই জিজ্ঞাসা করে। একদিন ও মাকে জিজ্ঞাসা করছে— "আচ্ছা মা, গাঁয়ের সবারই মা-বাবা দু'জনে মিলে একসাথে জুমে কাজ করে। তুমি একা একা কাজ কর কেন? আমার বাবা কোথায় মা? তিনি তোমার সাথে কাজ করে না কেন? কুফুর ছেলেকে বোঝাল— "তোমার বাবা যে দেবতা, আকাশের বুকে থাকেন। তিনি মানুষের সাথে কাজ করতে আসবেন কেন?

—"তাহলে নয়ও হল। কিন্তু বাবাতো আমাদের একটা ভাল ঘর উঠিয়ে দিতে পারেন।" চন্দ্রকুমার মাকে বলে।

—"তুমি চাইলে উঠিয়ে দেবেন বৈকি!" মা ছেলেরা কথার উত্তর দেয়। চন্দ্রকুমারের আগ্রহ বেড়ে যায়। সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করে— "আমি কি করে বাবার দেখা পাব মা?"

—"তুমি যদি এক মনে বাবাকে ডাকো, তা হলে তিনি ঠিক এসে দেখা দেবেন।" স্নেহের সুরে মা বলল।

সেদিনের মত মা-ছেলের কথা সেখানেই শেষ হল।

পরদিন চন্দ্রকুমার মাকে বলল— "মা" আমিতো এখন বেশ বড় হয়েছি। একা একা চলাফেরা করতে পারি। এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আসব, আমাকে গায়রিঙ থেকে নামিয়ে দাও। মা ছেলেকে বুকে নিয়ে বলল— "তুমি বড় হলেও তত বড় হওনিতো। বনে কত জন্তু জানোয়ার রয়েছে বাবা; কখন ওদের পায়ের নীচে পড়ে চেপ্টে যাবে। আমার খুব ভয় করছে।

—"তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না মা! আমি ঠিক ফিরে আসব দেখে নিও। কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না। ছেলে মাকে সাহস দেয়।

ছেলের পীড়াপীড়িতে কুফুর চন্দ্রকুমারকে গায়রিঙ থেকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হল। নীচে নেমে গান গেয়ে গেয়ে থপ থপ পায়ে এগিয়ে চলে চন্দ্রকুমার।

আমি মায়ের সোনামণি,
আমায় মারবে কে!
চাঁদের ছেলে হলে আমি
আমায় খাবে কে!
হই ..... হই ..... হই .....!

কিছুদূর গিয়েই ঝোপের আড়ালে সুবিধামত একটা জায়গাতে বসে মায়ের কথা মত এক মনে বাবাকে ডাকতে লাগল চন্দ্রকুমার। ছেলের ডাকে এক সময় চন্দ্রমাদেব এসে দেখা দিলেন। তার শরীরের দিব্য কান্তিতে চারদিক আলো হয়ে গেল। বাবাকে দেখেই চন্দ্রকুমার গড় হয়ে প্রণাম করল। এবার হাত জোড় করে বাবাকে বলল— "তুমি দেবতা, আমার বাবা। তুমি ইচ্ছা করলেই মায়ের কষ্ট দূর করে দিতে পার। মা আমাকে নিয়ে কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।" চন্দ্রমাদেব ছেলের দিকে স্নেহের চোখে চেয়ে বললেন— "তা পারি বৈকি! কিন্তু তোমার মা যে আমার কাছে কিছুই চান না। তোমরা চাইলে তোমাদের সব কিছু হতে পারে। এবার চন্দ্রকুমার নিজের কথায় এল। সে বলল— "বাবা আমি তোমার ছেলে হয়ে ব্যাঙ হয়ে আছি। খুব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাই। আমি কি করে মানুষ হব?" এবার চন্দ্রমাদেব হেসে বললেন—"বাচ্ছা, তুমি আমারই ছেলে বটে। তবে কোন এক দেবতার কারণে তুমি ব্যাঙ হয়ে আছ। যদি কোন নারী তোমাকে পতিরূপে বরণ করে নেয়, তাহলেই তোমার খোলাটি খসে যাবে। সেদিন আর খুব দূরে নয়। "চন্দ্রকুমার আশ্বস্ত হয়ে বাবাকে বলল— 'বাবা, মা চান আর না-ই চান, আমি বলছি আমরা যাতে থাকতে পারি তুমি এমন একখানা গায়রিঙ তুলে দাও।" —আচ্ছা—আচ্ছা, তা হবে বলে চন্দ্রমাদেব চলে গেলেন। থপ থপ পায়ে চন্দ্রকুমারও ফিরে এল মায়ের কাছে। বাবার সাথে যে তার দেখা হয়েছিল একথা চন্দ্রকুমার মাকে বলল না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই চন্দ্রকুমার মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওদের গায়রিঙের বারান্দায়। ওরা দু'জনেই দেখল, ওদের গায়রিঙ থেকে খানিকটা দূরেই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক গায়রিঙ — যেন একটা রাজবাড়ী। ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্তর সাজানো রয়েছে। ঘরটা চন্দ্রকুমারের খুব পছন্দ হল। কুফুর ভাবল, চন্দ্রমাদেব ওদের কষ্ট দেখে ঘরটা তুলে দিয়েছেন হয়ত। তাই ছেলেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

মা-ছেলে নতুন ঘরে উঠে এসেছে। এর মাঝে একদিন চন্দ্রকুমার মাকে বলল— "মা আমাকে গায়রিঙ থেকে নামিয়ে দাও। আমি বাজারে যাব। শুনে মার বুক কেঁপে উঠে। বাজারে যে অনেক লোক? এতটুকুন ছেলে, পায়ের নীচে পড়েই চেপ্টে যাবে। ছেলে কিন্তু নাছোড়বান্দা। অগত্যা নামিয়ে দিতে হল মাকে। গায়রিঙ থেকে নেমে চন্দ্রকুমার চলে গেল

ওই জায়গাটাতে— সেদিন যেখানে বাবার সাথে দেখা হয়েছিল। আজও চন্দ্রমাদেবকে ডাকতেই এসে গেলেন। বাবা আসতেই চন্দ্রকুমার বলল—বাবা, তুমি যে বলেছিলে শীগগীরই আমি মানুষ হব। হাটে-বাজারে যেতে পারব, মানুষের ছেলেদের সাথে খেলতে পারব। কিন্তু আজও তা পারছিনা তো। সারাক্ষণ ব্যাঙ হয়ে থাকতে আমার খুব বিচ্ছিরি লাগে।

চন্দ্রমাদেব ছেলেকে কোলে নিয়ে বললেন— "দুঃখ করিস না বাছা, তোকে আরও কিছুদিন ব্যাঙ হয়েই থাকতে হবে। সময় হলে ঠিকই তোর খোলাটা খসে যাবে। তবে এখন থেকে তুই যখুনি ইচ্ছা করবি তখনি খোলাটা খুলে মানুষ হয়ে চলাফেরা করতে পারবি। কিন্তু কাজ শেষ হলে খোলাটি এঁটে আবার ব্যাঙ হয়েই থাকতে হবে। মনে রাখিস, কোন মানুষের সামনে কিন্তু একাজটি করতে পারবি না। খুব লুকিয়ে করবি।" চন্দ্রকুমার তাতেই রাজী হয়ে বলল— 'তাহলে বাবা আমাকে এক্ষুণি একটা ঘোড়া ও কিছু টাকা দাও। বাজারে যেতে খুব ইচ্ছা করছে।"

"আচ্ছা— আচ্ছা," বলে চন্দ্রমাদেব হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

চন্দ্রমাদেব চলে গেলে চন্দ্রকুমার গাঁয়ের খোলাটি একটা গর্ত্তে লুকিয়ে রেখে ঘোড়ায় চড়ে বাজারে গিয়ে হাজির হল। কোন এক রাজার ছেলে এসেছে ভেবে হাটের লোকেরা পথ ছেড়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। চন্দ্রকুমার খুব তাড়াতাড়ি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্তর কিনে ফিরে এল সেই গাছের গোড়ায়— যে গাছের গর্ত্তে খোলাটি লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। এবার ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে গর্ত্ত থেকে খোলাটিকে গায়ে চড়িয়ে সোনাব্যাঙ হয়ে ফিরে এল গায়রিঙের দোর গোড়ায়। মাকে ডাকতেই মা বেড়িয়ে এল। ছেলে সাথে একরাশ সওদা-পত্তর দেখে মা তো অবাক। —"কি বাছা, এগুলি কি করে কিনলে?" মা জিজ্ঞেস করতেই চন্দ্রকুমার বলল— "তা মা, হাটে যেতে একজন লোকের সঙ্গে দেখা, তিনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন। তা দিয়েই কিনে আনলাম।" কুফুর ভাবল, হয়ত চন্দ্রমাদেবই ওকে টাকা দিয়েছেন।

চন্দ্রকুমার যৌবনে পা দিয়েছে। এ ওর মুখে শুনেছে, দূরে কোথাও রাজ বাড়ী আছে। কত দালান কোঠা, আর কত লোকজন সেখানে। তার খুব সখ হল সেও রাজবাড়ী দেখতে যাবে। তাই মাকে একদিন বলল— "আমি আজ রাজবাড়ী দেখতে যাব মা। আমাকে নামিয়ে দাও।" ছেলের কথা শুনে মা তো ভয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড়। ছেলেকে কোলে নিয়ে বলল— "সে যে অনেক দূর বাছা। অনেক পথ হেঁটে যেতে হয়। পথও ভাল নয়। পথে কত জন্তু জানোয়ার ওত পেতে বসে আছে। তোকে টুক্ করে গিলে ফেলবে। রাজবাড়ীতে রয়েছে কত সেপাই-সান্ত্রী— সে যে খুব ভয়ের। সেখানে যাসনে বাবা। ছেলে কিন্তু দমবার পাত্র নয়। সে যাবেই। মাকে সে বুঝিয়ে বলে— তুমি মিছিমিছি ভয় করোনা মা। আমি চন্দ্রমাদেবের ছেলে। আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি ঠিক চলে

আসব।

ছেলের মুখে চুমু খেয়ে অগত্যা গায়রিঙ থেকে নামিয়ে দিল কুফুর। যাবার আগে ছেলেকে বার বার বলে দিল— "দেখিস্ বাছা, সাবধানে যাস্। বিপদে পড়লে তোর বাবাকে ডাকিস্।" ছেলে থপ থপ করে এগিয়ে চলল। যদ্দুর দেখা যায়— ছেলের পথের দিকে তাকিয়ে রইল কুফুর।

কিছুদূর গিয়েই চন্দ্রকুমার বাবাকে ডাকল। ডাকতেই চন্দ্রমাদেব্ এসে ছেলেকেই দেখা দিলেন। চন্দ্রকুমার বাবার কাছ থেকে একটা তেজী ঘোড়া ও এক প্রস্ত রাজার ছেলের পোষাক চেয়ে নিল। এবার ব্যাঙের খোলাটি গাছের গর্ত্তে লুকিয়ে রেখে ঘোড়া হাকিয়ে পথে এগিয়ে চলল চন্দ্রমাদেবের ছেলে চন্দ্রকুমার।

পাহাড় জঙ্গল পেড়িয়ে একসময় চন্দ্রকুমার রাজধানীর কাছে গিয়ে পৌঁছল। ঘোড়া হাকিয়ে গেলে পাছে লোকের নজরে পড়ে, তাই ঘোড়াটিকে জংগলে লুকিয়ে রেখে চন্দ্রকুমার পায়ে হেঁটেই রাজবাড়ী দেখতে এগিয়ে চলল।

সারাদিন চন্দ্রকুমার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। দেখা যেন আর শেষ হতে চায় না। রাজার হাতী শালে হাতী, ঘোড়া শালে ঘোড়া, কত দাস দাসী, সেপাই-সান্ত্রী—সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। এখানে সেখানে কত আকাশ ছোঁয়া দালান— দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দিনের শেষে চন্দ্রকুমার এল রাজবাড়ীর সরোবরের পাশে। সরোবরের মাঝখানে সুন্দর জলতরঙ্গ ঘর। এঘরে রোজ বিকেলে রাজকন্যা হাওয়া খায়।

রোজ দিনের মত সেদিনও রাজকন্যা জলতরঙ্গ ঘরে হাওয়া খাচ্ছিল। সে সময় চন্দ্রকুমারও যাচ্ছিল সরোবরের পাশ দিয়ে। জলতরঙ্গ ঘর থেকে রাজকন্যা দেখল— এক রাজপুত্র সরোজরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রকুমারের রূপ দেখেই রাজকন্যা মজে গেল। একটি দাসীকে পাঠিয়ে রাজপুত্রকে ডেকে আনাল। দাসীর সাথে চন্দ্রকুমার জলতরঙ্গ ঘরে উঠে এল। রাজকুমারী দেখল চন্দ্রকুমারকে—চন্দ্রকুমারও দেখল রাজকন্যাকে। দু'জনেই দু'জনের রূপে মুগ্ধ হল। দুজনে দু'জনকে ভালবাসল।

বেলা যাচ্ছিল। চন্দ্রকুমার সেদিনের মত রাজকুমারীর নিকট বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

সেদিন থেকে রোজ একবার করে চন্দ্রকুমার রাজবাড়ীতে আসতে লাগল। রাজবাড়ীতে এলেই রাজকন্যার সাথে দেখা হয়। কোনদিন জলতরঙ্গ ঘরে, কোনদিন বা রাজার ফুল বাগানে।

একদিন কথাচ্ছলে রাজকুমারের পরিচয় জানতে চাইল। চন্দ্রকুমারও অপকটে তার জীবনের কাহিনী বলে শোনাল। তার মায়ের দুঃখের কাহিনী চন্দ্রমাদেবের ছেলে হয়েও তার ব্যাঙ জন্মানোর কথা — কোন কিছুই বাদ গেল না। এ সব শুনে কুমারীতো অবাক! এমন

রূপবান রাজকুমার কি কখনো ব্যাঙ হতে পারে! কুমারী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ও ভাবছে, কুমার হয়তো ছলনা করছে। তাই কুমারী বলছে— "তুমি কি আমাকে ছলনা করছ কুমার? মানুষের ঘরে কি কখনো ব্যাঙ হতে পারে?" —তোমার বিশ্বাস না হলে কাল আমি তোমার কাছে ব্যাঙ হয়েই আসব। ঘৃণা করবে না তো?" চন্দ্রকুমার বলল। চন্দ্রকুমারের কাহিনী রাজকন্যার নিকট কোন এক রূপকথার কাহিনীর মতই মনে হতে লাগল। কুমারী বলল— "ঘৃণা করব কেন কুমার? আমাদের জাতির এক মহীয়সী নারীও সাপকে বিয়ে করেছিলেন —ভালবেসেছিলেন। আমিও ঠিক পারব দেখে নিও। আমি যাকে ভালবেসেছি, যাকে স্বামীরূপে মনে মনে বরণ করে নিয়েছি – সে সাপ হোক, ব্যাঙ হোক, সে আমার স্বামীই।" কুমার হেসে উত্তর করল— "আচ্ছা, তা দেখা যাবে।"

পরদিন চন্দ্রকুমার রাজধানীতে আসার সময় ব্যাঙের খোলসটি সঙ্গে এনে কোথাও লুকিয়ে রাখল। রাজকুমারীর সাথে দেখা হতেই লকানো জায়গা থেকে খোলাটি গাঁয়ে এঁটে লাফাতে লাফাতে কুমারীর কাছে এসে হাজির হল। —"কুমারী তোমার স্বামী এসেছে। এবার তাকে বরণ করে নাও দিকিনি" এই বলে ব্যাঙরূপী চন্দ্রকুমার খানিকটা দূরে নাচতে লাগল। কুমারী অবাক হয়ে দেখল— খানিক দূরেই একটি সোনাব্যাঙ ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। কুমারী ব্যাঙটিকে তুলে নিয়ে আদর করছে, আর বলছে—

অজগরকে বরণ করল।
পুণ্যবতী নারী।
সোনাব্যাঙকে বরণ করতে
আমিও যে পারি।।

কিছুক্ষণ পর চন্দ্রকুমার জঙ্গলে গিয়ে আবার মানুষের রূপ ধরে এসে রজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করল— "কি গো কুমারী, এবার তোমার সোনা ব্যাঙ রাজকুমারকে দেখলে তো? ভয় পেয়ো না, বাবা বলেছেন— কোন এক নারী যদি আমাকে পতিরূপে বরণ করে নেয়— তাহলেই দেবতার কোপ কমে যাবে। আমার খোলাটিও চিরদিনের মত খসে যাবে। আমি সব সময় মানুষের রূপ ধরে থাকতে পারব।

আজকাল ছেলের ভাবগতিক দেখে কুফুরের ভারী চিন্তা হয়। বাড়ীতে যখন থাকে— সব সময় আনমনা হয়ে কি যেন চিন্তা করে। তাই একদিন ছেলেকে জিজ্ঞেস করে কুফুর— "বাছা অসুখ বিসুখ করেনি তো? সারাদিন অমন আনমনা হয়ে থাকিস কেন?" — "না মা, আমার কোন অসুখ বিসুখ করেনি। আমায় খোলাটি কখন খসবে তাই শুধু ভাবি।" ছেলে বলে। ছেলেকে কোলে নিয়ে মা সান্ত্বনার সুরে বলে — "আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক বাবা; তোর বাবার কথা তো মিথ্যে হবার নয়। সময় হলে সব হবে।"

রাজা-রাণীও রাজকুমারীকে নিয়ে ভয়ানক চিন্তায় পড়েছেন। নাম-ধাম জানা নেই — কোথাকার এক ছেলেকে নাকি রাজকুমারী ভালবেসেছেন। রাজা একদিন আড়াল থেকে

রাজকুমারীকে ছেলেটির সাথে গল্প করতেও দেখলেন। দেখতে শুনতে ছেলেটি তো মন্দ নয়, রাজকুমার বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কাদের ছেলে, ঘরদোর কেমন জেনে তো। রাজকুমারীকে যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। রাজা গোপনে এর ওর কাছ থেকে কিছু কিছু খবর নিলেন। কিন্তু তাতে মন ভরল না। তাই একদিন বুড়ো মন্ত্রীকে পাঠালেন চন্দ্রকুমারদের বাড়ীঘর দেখে আসতে — আরও ভাল করে খবরাখবর নিতে।

রাজবাড়ী থেকে যেদিন ওকে দেখতে এল, চন্দ্রকুমার ওদের সামনে না এসে লুকিয়ে রইল। আর মাকে বলে পাঠাল — ওরা আমাকে দেখতে চাইলে 'চন্দ্রকুমার বাড়ীতে নেই' বলবে। বুড়ো মন্ত্রীর চন্দ্রকুমারদের ঘরদোর দেখে খুব পছন্দ হল। এ যেন এক রাজবাড়ী। কুফুরও রাজার লোকদের খুব করে খাইয়ে দাইয়ে দিল। ওরা খুব খুশি হল। রাজবাড়ীতে ফিরে ওরা যেমন যেমন দেখেছিল — সব কিছু রাজাকে বলে শোনাল; সব জেনে শুনে রাজা চন্দ্রকুমারের সঙ্গেই কুমারীর বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।

রাজকন্যার বিয়ে। মহা ধুমধাম পড়ে গেল। নহবতখানায় দিনরাত বাজনা বাজতে লাগল। এখানে ওখানে খাওয়া দাওয়া, নাচ গানের বিরাম নেই। বিয়ে দেখতে কত লোকের যে সমাগম হল বলে শেষ করা যায় না।

বিয়ের দিন রাজকুমারীকে সাজানো হল বিয়ের সাজে। রাজবাড়ীর উঠোনে বেদী বানানো হল সুন্দর করে। হাতী ঘোড়া সাজিয়ে বাদ্য বাজনা বাজিয়ে একদল চলে গেল বর আনতে। কখন বর আসবে সবাই পথ চেয়ে আছে। এক সময় হাতীর পিঠে চড়ে বর এলও বটে। সবাই এগিয়ে গেল বর দেখতে। কিন্তু বর কোথায়। হাতীর পিঠে বরের আসনে বসে আছে মস্ত বড় এক সোনাব্যাঙ! রাজার জামাই কিনা সোনাব্যাঙ! উপস্থিত লোকজনেরা দুয়ো — দুয়ো করতে করতে যে যার মত চলে গেল। লজ্জায়, অপমানে রাজা-রাণী সেই যে অন্দরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে বসে রইলেন আর বেরোলেন না। এদিকে রাজকুমারী কিন্তু মালা হাতে এগিয়ে গেল পতি বরণ করতে। রাজকুমারী এগিয়ে এলে চন্দ্রকুমারও হাতীর পিঠ থেকে একলাফে নেমে এল। রাজকন্যা সোনাব্যাঙটিকেই প্রণাম করে মালা পরিয়ে দিল। চন্দ্রকুমারের বিয়ে হল।

বিয়েতো হল। এবার বাড়ী যাবার পালা। ব্যাঙরূপী চন্দ্রকুমার বৌ নিয়ে নেচে গেয়ে এগিয়ে চলল গাঁয়ের পথে। গাঁয়ে এসে সে গাইতে লাগল —।

শাঁখ বাজে, বাদ্যি বাজে,
আরও বাজে ঢাক।
তাক ডুমাডুম, ধিনাক ধিনা
তাক ডুমাডুম তাক ॥
চাঁদের ছেলে বিয়ে করে

রাজকন্যা এক ॥
কে দেখবে দেখতে এস,
তাক ধিনাধিন তাক॥

গান শুনে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই দৌড়ে দেখতে এল। চন্দ্রকুমারের মা ছেলে-বৌকে খুব আদর করে ঘরে নিয়ে তুলল।

চন্দ্রকুমার আর রাজকুমারী দু'জনে সুখেই ঘর করছে। চন্দ্রকুমারের ব্যাঙের খোলাটি এখনও খসেনি। দিনভর চন্দ্রকুমার ব্যাঙ হয়েই থাকে। রাত্তিরে ঘুমুতে যাওয়ার আগে খোলাটি খুলে লুকিয়ে রাখে। একদিন রাত্তিরে চন্দ্রকুমার ঘুমিয়ে আছে। রাজকুমারী চুপি চুপি উঠে খুঁজে পেতে খোলাটি হাতে নিয়ে পোড়াতে যাবে অমনি খোলাটি মানুষের সুরে বলে উঠল — আমাকে পোড়ানোর আগে দু'একটি কথা শোন রাজকন্যা। অবাক হয়ে শুনল, খোলাটি মানুষের মত কথা বলছে! রাজকন্যা খোলাটির দিকে চেয়ে বলল — "তুমি কি বলতে চাও, বল। শীগ্‌গীর তোমার পরিচয় দাও। নয়তো এক্ষুণি পুড়ে ফেলব।" খোলাটি বলতে লাগল — "রাজকন্যা আমি নকছু মৌতায়" (গৃহ দেবতা)। আমার পূজা যাতে প্রচার হয় তার জন্যই একদিন চন্দ্রকুমারের শরীর জড়িয়ে ছিলাম। তুমি আমার পুজোর ব্যবস্থা করে দাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। রাজকন্যা বলল — তোমার পুজো দিলে কি কি মঙ্গল হবে, কোথায় তোমার অধিষ্ঠান হবে। এসব তো কিছুই বললে না।" "ঘরের এক কোণায় হবে আমার অধিষ্ঠান।" দেবতা আরও বলল, আমাকে পুজো দিলে অপদেবতারা গেরস্থের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আমি ঘরদোর পাহারা দিয়ে গেরস্থকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে থাকি।" রাজকন্যা বলল — "বেশ, তাহলে তাই হবে। আমি তোমার পূজার ব্যবস্থা করছি। তুমি আমাদের ঘরের কোণে থেকে আমাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

রাজকন্যার হাতের বাঁধন কিছুটা আল্‌গা হতেই 'নকছু মৌতায়' ছায়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। রাজকন্যা আগুন জ্বেলে খোলাটি আগুনে ফেলতেই চন্দ্রকুমার ভীষণ জ্বালায় চীৎকার দিয়ে জেগে উঠল। রাজকন্যা তড়িঘড়ি পাখা নিয়ে এগিয়ে গেল বাতাস করতে। মা কুফুরতি দৌড়ে এল ওঘর থেকে। এসেই কিছুটা গোবর এনে ছেলের সারা গায়ে লেপে দিতেই শরীর শীতল হল। ভীষণ জ্বালার পর আরাম পেয়ে চন্দ্রকুমার শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। মা কুফুরতি এদ্দিনে ছেলের মানুষরূপ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

এদিকে কুফুরতির মামা-মামী বুড়ো হয়ে গেছে। ওরা দুজনে এখন এখানেই থাকে। চন্দ্রকুমারের ব্যবহারে ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁয়ের সবাই খুশি।

লজ্জায়, ঘৃণায় রাজা-রাণী এদ্দিন মেয়ের খবর নেননি। লোকের মুখে চন্দ্রকুমারের সুখ্যাতি শুনে মেয়ে-জামাইকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ে জামাইকে দেখে রাজা-

রাণী দু'জনেরই খুব আনন্দ হল। একদিন রাজা চন্দ্রকুমারকে ডেকে নিয়ে বললেন — "বাবা, আমার ছেলে নেই। তুমিই আমার ছেলে। আজ থেকে তোমার হাতেই রাজ্যভার তুলে দিচ্ছি। এখন থেকে তুমিই রাজ্যপাট দেখবে — প্রজাদের পালন করবে।"

খুব জাঁকজমক করে চন্দ্রকুমার সিংহাসনে বসল। সেদিন তার মা, আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই রাজবাড়ীতে এল। স্বয়ং চন্দ্রমাদেব এসে ছেলেকে আশীর্বাদ করে বললেন — "বৎস, আজ থেকে তুমি চন্দ্রবংশীয় রাজা বলে পৃথিবীতে পরিচিত হবে। তোমার বংশের রাজাগণ যুগ যুগ ধরে গৌরবের সঙ্গে প্রজা পালন করবে। তুমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজা বলে খ্যাতি লাভ করবে। যাবার আগে চন্দ্রমাদেব ছেলেকে একটি "অর্দ্ধচন্দ্রবাণ" দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন।

চন্দ্রকুমার সিংহাসনে বসার কিছুকাল পর বুড়ো রাজা-রাণী নীরবে ভগবানকে ডাকার জন্য মনু নদীর তীরে মায়ানি পর্বতে চলে গেলেন। চন্দ্রকুমার প্রজাদের নিজের সন্তানের মত পালন করতে লাগল। তাই প্রজাগণ তাকে 'ফা' (পিতা) বলে ডাকত। সেদিন থেকে চন্দ্রবংশের রাজাদের নামের সাথে 'ফা' যোগ করে বলা হয়ে থাকে ❑

কাঞ্চনমালা

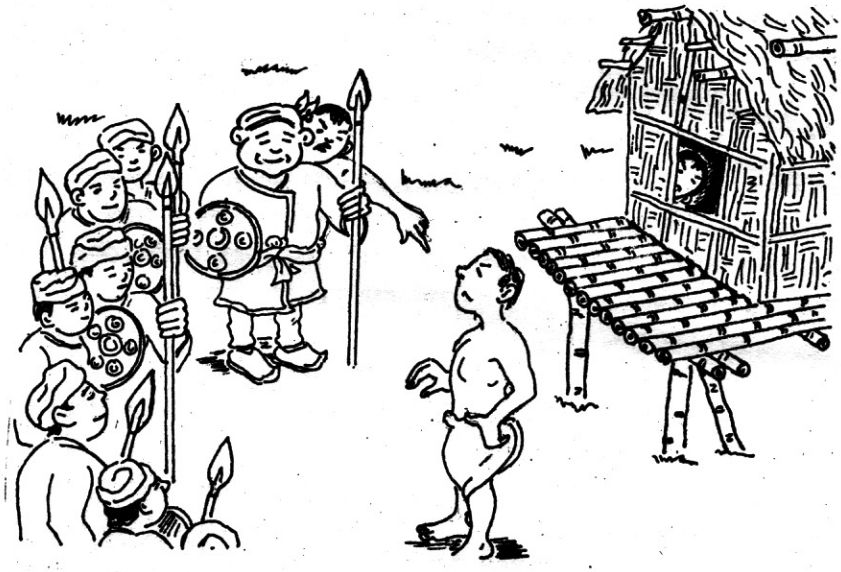

প্রাচীনকালে আমাদের এ রাজ্যের রাজার সঙ্গে অন্য কারো যুদ্ধ বাঁধলে রাজা গাঁয়ে গঞ্জে 'ফুরাই' (সৈন্য দলে এসে যোগদানের জন্য পরোয়ানা বিশেষ) পাঠাতেন 'ফুরাই' গাঁয়ে এলেই গাঁয়ের শক্ত সমর্থ ছেলেরা—তা' ছেলে মেয়ের বাবা, কিংবা নতুন বিবাহিত যেই হোক না কেন, রাজার সৈন্যদলে এসে যোগ দিতেই হত। অবিবাহিত যুবক ছেলে হলে তো কথাই ছিল না। যুদ্ধে যাওয়া ওদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যোগ না দিয়েও উপায় ছিল না। যারা সৈন্যদলে যোগ না দিয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে থাকত, পরে রাজার 'বিরিন্দিয়া' (সৈন্য, পুলিশ) এসে ওদের ধরে নিয়ে যেত, সাজাও দিত।

এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া এক যুবকের স্ত্রী — নাম কাঞ্চনমালা। ওদের বিয়ে হয়েছে খুব বেশীদিন হয়নি —দু'তিন মাস হবে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছিল এক গাঁয়ের লোক। দু'জনেই দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু খুব বেশীদিন ওদের দু'জনের একসাথে থাকা

হলনা। "হাচিখুংগে" নাকি যুদ্ধ লেগেছে। কাজেই আর পাঁচজনের সঙ্গে কাঞ্চনমালার স্বামীকেও যেতে হবে।

কাঞ্চনমালার ভাসুর অনেকদিন ধরেই রাজার সৈন্যদলে কাজ করে — রাজধানীতে থাকে। কাঞ্চনমালাকে সে যখন দেখেছে তখন ও খুব ছোট। বুকে 'বিছা' (বক্ষাবরণী) বাঁধেনি। এবার ছোট ভাইয়ের বিয়েতে এসে ভর যৌবনা কাঞ্চনমালাকে দেখে ওর খুব মনে ধরল। যে করেই হোক কাঞ্চনমালাকে তার পেতে হবে।

এমনি সময়ে হাচিখুংগের যুদ্ধে যাবার খবর এসেছিল। খবর এলেও কাঞ্চনমালার বর কিন্তু গেল না। ঘরে প্রিয়তমা নতুন বৌ, ওকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই মন সরছিল না। এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল কাঞ্চনমালার ভাসুর। একদিন সেই রাজার সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে — কাঞ্চনমালার স্বামীকে ধরে নিয়ে যেতে। ও ভেবেছিল, যে করেই হোক কাঞ্চনমালার স্বামীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে একসময় হয়তো কাঞ্চনমালাকে পাওয়া যাবে।

ওদের দেখেই কাঞ্চনমালার বুক দুরু দুরু করে উঠল। স্বামীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় সে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কেঁদে কেঁদে, বলতে লাগল —

নৌঙবাই কাইজাগমা হায়া বায়াখ'
হায়ালে যারা — হাপলক অংবা;
নৌঙবাই কাইজাগমা বেদী বায়াখ'
বেদী মুইবেরা অংবা।
কলিজা —
তমছা গতৌই চাকছাই ফায়খা —
দকতরি বিরিন্দিয়া।
বগাছাগতৌই চাকছাই ফায়খা —
রাজানি বিরিন্দিয়া।
কলিজা —
দিদা কায়ছালে চাকুরি তংঅ
দিদা কায়ছান ছুংদি।
হাচৌক ছাকাঅ পুনছিকাম তংঅ —
পুনছিকাম পায়ৌই খাংদি।
কলিজা —
কংউই খুলুমদি দরগৌই নাদি

দিদান বিদায় নাদি।

য়াকছি খকবা, য়াগ্রা খকবা

দরগাঁই নাদি, খুলুমাঁই নাদি।

দিদান বিদায় নাদি।

অনুবাদ ঃ— তোমার সঙ্গে যে বিয়ে হয়েছে তার 'হায়া' (মঞ্চ) এখনও ভাঙেনি — তা মাটির ঢিপি হয়ে আছে। তোমার সঙ্গে যে বিয়ে হয়েছে, বেদীর চিহ্ন এখনও লোপ পায়নি — বেদীর বেড়াগুলো এখনও তরকারি বাগানের বাঁশ হয়ে আছে।

ওগো প্রিয়তম,

বন মোরগের মত লাল হয়ে (অর্থাৎ বন মোরগেরা দল বেঁধে চরতে থাকলে দূর থেকে যেমন শুধু লালই দেখা যায়) — বক পাখির মত শুধু সাদা সাদাময় হয়ে (অর্থাৎ অনেকগুলো বক পাখি জলাজমিতে খাবারের সন্ধানে বসে থাকলে দূর থেকে যেমন দেখায়) আসছে রাজার সৈন্যগণ।

ওগো প্রাণাধিক,

তোমার দাদা তো একজন চাকুরি করেন। তার কাছে পরামর্শ নাও। পাহাড়ে 'পুনছিকাম' (রাম ছাগল) পাওয়া যায়, তা কিনে পূজো দাও।

ওগো প্রাণপ্রিয়,

ডানহাতে পাঁচটি টাকা বাঁ হাতে পাঁচটি টাকা নিয়ে দাদাকে নত হয়ে প্রণাম কর। দাদার নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর।

এতক্ষণে বিরিন্দিয়ারা গায়রিঙে উঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেছে। কাঞ্চনমালার স্বামীও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সে বলছে —

য়াখ্লি খুপাং বিছিকাই ফায়খা

তংগাঁইছে মান গীলাক।

অ কলিজা —

মুকতীয় হুজাদি, উানোমা খিবদি

চুজাদি মায়রীঙ চুছা।

অনুবাদ ঃ— সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেছে ওরা, আর থাকতে পারব না। ওগো প্রাণ, চোখের জল মুছে নাও, ভাবনা তুলে রাখ। চালের পুঁটলি (পথে খাবারের জন্য) বেঁধে দাও এসে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে সৈন্যগণ বলতে লাগল —

ছিমলিক বফর লামথাই বছকদি,

ফায়াই চীঙ আচুকনানি —

অনুবাদ ঃ— অঞ্জনির চামড়ার মত মসৃণ পাটি পেতে রাখ। আমরা এসে বসব। কাঞ্চনমালা তার স্বামীকে বলল —

অ কলিজা —
নীঙ বাই কাইজাগমা মেথি কাগয়াখ'
হাচিখুং রাইবার ছংবা,
নীঙবাই কাইজাগমা হানতা কাগয়াখ'
চালিখুং রাইবার ছংবা।
অ কলিজা —
নীঙ বাই কাইজাগমা,
রিত্রাক থানছা থুলে থুখামুন,
তাকা কেবেংগ' নীঙবাই।
য়াকুং জাংলা ছুরীই থুখামুন,
য়াকুং কেবেংগ নীঙবাই।
দুমা বাইছানি সেবা ছিয়াখ'
(কলিজান) হাচিখুং বাইবার ছংবা।
নীঙ থাংতিনি আংব ফায়ানু,
য়াকুং ছুনানি জরা চীগনাদে
আনব' তাইদি লগি।
দুমা সীগনানি জরা চীগনাদে
আজব' তাইদি লগি।
নিনি কতগনি থীয় কীলাইথিনি
আর্ণেব' কীলইনানি —।
অ কলিজা —
আনব' তাইদি লগি।

অনুবাদ ঃ— ওগো প্রিয়তমা, আমাদের বিয়ের সময় ব্যবহৃত সুগন্ধ তেলের ঘ্রাণ আজও মিলিয়ে যায়নি। বিয়ে বাড়ীর ভোজের এঁটো (এঁটো পাতাগুলো) আজও রয়ে গেছে। বিবাহ কুঞ্জে অনুষ্ঠিত যজ্ঞস্থালীয় শেষ চিহ্নটুকু আজও মুছে যায়নি।
ওগো প্রিয়তমা —,

তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে — ভেবেছিলাম একটা 'রিদ্রাক' -এ (ত্রিপুরীদের নিজ হাতে বোনা এক প্রকার কাপড় — বিছানার চাদরের জন্যও যা' ব্যবহার করা হয়ে থাকে) দু'জনে ঘুমোব। কিন্তু পাছড়ার কিনারার সুতোগুলো বাদ সাধছে।

ওগো প্রিয়তমা, আজ অবধি এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে দিয়েও সেবা করতে পারিনি। এরই মধ্যে এসে গেল তোমার যুদ্ধে যাবার ডাক। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। পা ধুইয়ে দেবার যোগ্যও যদি হই — আমাকে সঙ্গে নাও। তামাক সেজে দেবারও যোগ্য যদি হয়ে থাকি — আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার কণ্ঠের রক্ত যেখানে ঝরে পড়বে— আমার কণ্ঠের রক্তও সেখানে ঝরে পড়ুক (অর্থাৎ যেখানে তোমার মৃত্যু হবে আমারও সেখানে মৃত্যু হোক)।

ওগো প্রাণপ্রতিম, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। কাঞ্চনমালার স্বামীও তখন বলছে —

অ কলিজা —
পছচিম যাত্রা চীঙ খীলায়নানি —
মুকতীয় তা ফুনুকজাদি।
অ কলিজা —
চাইছর উা রমাই নীঙ তমা মা মক্
রি বগনাখেইবা বগদি।
বাকা উা রমাই নীঙ তমা মা মক্
মায়তীক বগনাখেইবা বগদি।

অনুবাদ ঃ— ওগো প্রিয়ে, পশ্চিম দিকে আমরা যাব, এসময় চোখের জল দেখিও না। ওগো প্রাণ, 'চাইছর' (কাপড় রাখার আলনা বিশেষ) -এর বাঁশ ধরে মুখ ম্লান করে তুমি কি ভাবছ? কাপড় রাখবে তো রাখ। "বাকা"র (ভাতের হাঁড়ি ও রান্নার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্তর রাখবার জন্য ব্যবহৃত উনুনের উপরে ঝুলানো মাচা) বাঁশ ধরে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? ভাতের হাঁড়ি রাখবেতো রেখে দাও।

কাঞ্চনমালার স্বামী আরও বলল —

মছ থাইছানি বিয়াল অংখেই
থাংদি দিদানি নগ'।
ছম কিছানি বিয়াল অংখাখেই
থাংদি দিদানি নগ।
রম' কংছানি বিয়াল আংখাখেই
থাংদি দিদানি নগ।

অনুবাদ ঃ— একটি লংকারও যদি অভাব হয় — দাদার ঘরে যেও। সামান্য নুনেরও যদি অভাব হয় — দাদার ঘরে যেও। উদুখলের মুষলটির যদি প্রয়োজন হয় — তবে দাদার ঘরে যেও।

এভাবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কাঞ্চনমালার স্বামী সৈন্যদের সঙ্গে চলে গেল।

দু'তিন মাস পর কাঞ্চনমালার ভাসুর একাই বাড়ী ফিরে এল। তার সঙ্গে ছোটভাই এল না।

ভাসুর বাড়ী ফিরে আসতেই কাঞ্চনমালা তাকে স্বামীর খবর জিজ্ঞাসা করছে।

লামথাই ছক ফায়খা, কবং ছকপায়খা;
নৌফায়ুং বর তঙবু?
য়াকুং ছুফায়দি, নগ' কাফায়দি —
নৌফায়ুংনি খপর ছাদি।
নৌফায়ুংনি বাগৌই বাতি বগমানি
খুরিছা বুয়া — খুরিকনীয় বুয়া —
খুরিকথাম নৌঙগৌই ছাদি।

অনুবাদ ঃ— পাটি ফিরে এল, বালিশ ফিরে এল; আপনার ভাইকে কোথায় রেখে এলেন? আসুন, হাত পা ধুয়ে ঘরে এসে বসুন; আপনার ভাইয়ের খবর বলুন। আপনার ভাইয়ের জন্য মদ তৈরী করে রেখেছিলাম। তা থেকে এক পাত্র নয়, দু' পাত্র নয়, তিন পাত্র খেয়ে বলুন, আপনার ভাই কেমন আছে!

দু'তিন পাত্র পান করে কাঞ্চনমালার ভাসুর বলল —

মায়যুঙ বখ্রক হলংনি দলান,
আরছে তঙগৌই ফায়'।

অনুবাদ ঃ— হাতীর মাথার মত গম্বুজওলা পাথরের যে দালান রয়েছে, সেখানেই আমার ভাইকে রেখে এসেছি।

তারপর—। আর কোনদিন কাঞ্চনমালার স্বামীর খবর আসেনি। কিন্তু কাঞ্চনমালা তাকে ভুলেনি।

তিনি ফায়খানা, লামা থুখানা,
খনালে ছকফায়ানু।

অনুবাদ ঃ— আজ হয়ত আসছে, পথে কোথাও হয়ত ঘুমিয়েছে। কাল ঠিকই এসে পৌঁছে যাবে।

এভাবে পথ চেয়ে চেয়ে কাঞ্চনমালার দিন যায়। কাঞ্চনমালার স্বামী আর কখনো ঘরে ফেরেনি ❑

নাঐ পাখীর গল্প

এক জুম চাষী। বুড়ো মা-বাবা, স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে ওর সংসার। মেয়েটি এখনও একেবারেই ছোট — মায়ের কোল ছাড়েনি। এমনি দিনে চাষীর বৌ গেল মরে। সংসারে রেখে গেল স্বামীকে আর ছোট মেয়ে খুমতিকে।

চাষীকে বাধ্য হয়ে আবার বিয়ে করতে হল। বছর ঘুরতেই চাষীর ঘরে আবার একটি মেয়ে হল। গায়ের রঙ হলুদ বর্ণ বলে নাম রাখল ওর করমতি। করমতি আর খুমতি দু'বোন। ওরা বড় হয়েছে। বিয়ের বয়স হয়েছে। দু'বোনে খুব ভাব। একসাথেই জুমের, ঘর গেরস্থালীর কাজকর্ম করে।

বড়বোন খুমতির গায়ের রং ছিল কালো। মনটাও ছিল খুব খারাপ। কি জুমের কাজ, কি গেরস্থালীর কাজ কোন কিছুতেই ও করমতির সঙ্গে পেরে উঠত না। তাই মনে মনে করমতিকে খুব হিংসা করত।

জুমের ফসল পেকেছে। ঘরে তুলতে হবে। দু'বোন লাঙ্গা (মাথায় বয়ে নেবার ঝাঁচি বিশেষ) মাথায় জুমে গেল একদিন। ছোটবোন জুমে গিয়ে তরকারি তুলে লাঙ্গা ভরতি করতে লাগল। ওদিকে বড়বোন খুমতি বেছে বেছে ফসল তুলেছে — আর দা দিয়ে কেটে কেটে খেয়ে ফেলছে। যেগুলো খেতে পারছে না — এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছে; লাঙ্গাতে একটি তরকারিও রাখল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটবোন করমতির লাঙ্গা ভরে গেল। এবার বাড়ী যাবার পালা। করমতি দিদিকে ডেকে বলল — "দিদি আমার লাঙ্গাতো ভরে গেছে। তোমার কতটুকু হল? চল এবার বাড়ী যাই। খুমতি উত্তর করল— তা, বোন, 'আমি যে একটা তরকারিও খুঁজে পাচ্ছি না'। কি করে লাঙ্গা ভরবে। তোর তো দেখছি লাঙ্গা উপচে পড়ছে। এক কাজ কর না বোন, তোর লাঙ্গা থেকে আমাকে কিছু দিয়ে দে-না। না হলে বাড়ীতে গিয়ে আমি কি দেখাব, বল দিকিনি।' দিদির কথায় করম বেশ বিরক্ত হল। সে দিদিকে বলল —"না দিদি আমি একটি তরকারিও তোমাকে দিচ্ছি না। তুমি কাঁচা পাকা যা হাতের কাছে পেয়েছ — খেয়ে ফেলেছ। যেগুলো খেতে পারনি ফেলে দিয়েছ। এভাবে তোমার লাঙ্গা ভরবে কেন? বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে খাব বলেই আমি একটি তরকারিও খাইনি।"

খুমতি বলল —"রাগ করছিস কেন বোন? তোর লাঙ্গা থেকে কিছুটা দিয়ে দিলে তোর বোঝাটাও হাল্কা হবে। এত ভারী বোঝা তোর বইতে কষ্ট হবে যে।" করমতি বলল —"তাহোক, প্রত্যেক দিনতো এমনি ভারী বোঝাই বয়ে থাকি। আজও নেব। তা বলে আজ একটি তরকারিও তোমাকে দিচ্ছি না। রোজ তুমি তরকারি না তুলে আমার কাছ থেকেই চেয়ে নাও। একদিনও তুমি লাঙ্গা ভরতে পার না। সত্যি সত্যিই বলছি, আজ আমি তোমাকে একটিও দিচ্ছি না।"

খুমতি ছোট বোনের কথায় মনে মনে খুব রাগ করলেও মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না। দু'বোন নীরবে বাড়ীর পথে চলতে লাগল। ওদের জুম থেকে খানিকটা পথ এগিয়ে গেলেই একটা নদী। বাড়ীতে যেতে হলে নদীটা পেরিয়ে যেতে হয়। নদীর পারে এসে খুমতি করমতিকে বলল "চল করম, এখানে আমরা খানিকটা জিরিয়ে নেই।" নদী থেকে ওদের বাড়ী খুব একটা দূরে ছিল না। এ নদীর জলেই ওরা রোজ চান করে — খাবার জল নেয়। করমও দিদির কথায় রাজী হল। দু'জনেই একটা গাছের ছায়ায় লাঙ্গা রেখে জিরোতে লাগল। খুমতি ওরা যে গাছটার নীচে বসেছিল, এটা ছিল একটা বটগাছ। গাছটা ছিল ঠিক নদীর পার ঘেষে — ওর ডালপালাগুলোও নদীর ওপর পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। একসময় খুমতি নদীর ওপর ঝুলানো ডালটাকে দেখিয়ে বলল —'দেখছিস করম, ডালটা কেমন সুন্দরভাবে নদীর উপর ঝুলে আছে। ওতে দোলনা বেঁধে দোল খেতে খুব আরাম হবে। চল, একটা লতা নিয়ে আসিগে। খুমতি পাশের জঙ্গল থেকে লম্বা একটা লতা এনে চটপট গাছের ঝোলানো ডালটায় বেঁধে সুন্দর একটা দোলনা বানিয়ে ফেলল। এবার

দোল খাবার পালা। প্রথমে খুমতি দোলনায় চেপে ছোট বোনকে বলল "দুলিয়ে দে করম। ধীরে ধীরে দোলা দিস্ বোন। পড়ে যাব দেখিস্। খুমতি দোল খেতে লাগল।

নীচে থেকে এক সময় করম বলল —"দিদি, তুমিতো বেশ দোল খেলে। এবার নেমে এসে আমায় দাও দিকিনি। আমি খানিক দোল খেয়েনি।" খুমতি নেমে এল। করম দোলনায় চেপে বসলে খুমতি দোলাতে লাগল। পড়ে যাবার ভয়ে করম দিদিকে বলল — "ধীরে ধীরে দোলা দিও দিদি, পড়ে যাব দেখো।" খুমতি দোলনা দোলাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, কিছুটা ফল তরকারি দিতে বলেছিলাম। তা একটাও দিলি না। এবার তোকে মজা দেখাচ্ছি। খুমতি খুব জোরে জোরে দোলা দিতে লাগল। ভয় পেয়ে করম বলে উঠল — "এত জোরে দোলা দিওনা দিদি, পড়ে যাচ্ছি যে। খুমতি বোনের কথায় কান না দিয়ে আচমকা দোলনাটাকে একটা ধাক্কা দিল। টাল সামলাতে না পেরে করম নদীর জলে পড়ে গেল। ওদিকে নদীর জলেই ওত পেতে ছিল মস্ত একটা বোয়াল মাছ। খাবার ভেবে করমকে মুখে পুরে দিল। করম মুখে এতটুকুন রা করবারও সময় পেল না।

কাঁচা হলুদ বরণ করমতির ছোঁয়া পেয়ে নদীর সবটা জলই হলুদ হয়ে গেল। এমন যে হবে খুমতিও ভাবতে পারে নি। প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে দিয়ে করমতির ফল তরকারিগুলো নিজের লাঙ্গায় পুরে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এল। ওকে একা আসতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করল — "তুই একা এলি যে খুম, করম কোথায়? খুমতি উদাসীনভাবে উত্তর দিল —"ও ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। ক্ষিদে পেয়েছে বলে আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।" লাঙ্গাটি ঘরের এক কোণে রেখে খুমতি তাড়াতাড়ি গিয়ে খেতে বসল।

খুমতির ঠাকুর মা বুড়ী নদীতে চান করতে গেছে। ঘাটে নেমেই বুড়ী অবাক হয়ে ভাবছে, আজ দেখছি নদীর জলটা একেবারে হলুদ হয়ে গেছে। এমন তো কখনও দেখিনি! কেউ হয়ত হলুদ মিশিয়ে থাকবে। খানিকটা জল হাতে নিয়ে দেখল বুড়ী। না ঃ— হাতে তো কিছুই লাগছে না দেখছি। তবে জলে এত রং কোত্থেকে এল? থাকগে — বুড়ী চান করে কাপড় কাচতে লাগল। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড! ঘাটের তক্তার উপর বুড়ী যেইমাত্র কাপড় আছাড় দিচ্ছে, অমনি কে যেন করমতির সুরে বলে উঠল —"ওঃ— ঠাকুর মা, আমার পায়ে লাগছে যে।" ঠাকুর মা এদিক ওদিক চেয়ে নিল একবার। না — কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আবারও জোরে জোরে আছড়াতে লাগল কাপড়টা। এবারও ঠিক আগের মতই কে যেন বলছে "ওঃ - ঠাকুরমা আমার বুকে লাগছে যে।" ঠাকুরমা থমকে গেল। এবার কিছুটা দূরে সরে গিয়ে কাপড়টা আছড়াতে লাগল। এবারও কে যেন করুণ সুরে বলতে লাগল —"ওঃ ঠাকুরমা, আমার মাথায় লাগছে যে।" একবার দুবার-তিনবার। বার বার একই সুরে কে যেন বলছে। চারদিক চেয়ে নিল ঠাকুরমা বুড়ী। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। তবু ঠাকুরমা অনুমান করল, এ করমতি না হয়েই যায় না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে

জিজ্ঞাসা করল "করমতি, তুই কোত্থেকে বলছিস? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।" করমতি খুব ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল — "এই যে ঠাকুরমা, আমি ঘাটের নীচে বোয়াল মাছের পেটে রয়েছি। একথা শোনামাত্র ঠাকুরমা ঘাটের কাঠটা সরিয়ে ফেলতেই বিরাট এক বোয়াল মাছ নজরে পড়ল। মাছটা করমতিকে গলা অব্দি গিলে রেখেছে — সবটা গিলতে পারেনি। আস্ত মানুষটাকে গিলে মাছটা নড়তে চড়তে পারছে না। বুড়ী সমস্ত শক্তি দিয়ে মাছটাকে ডাঙায় টেনে তুলল।

এক্ষণি করমতিকে মাছের পেট থেকে বের না করলে মারা পড়বে। নদীর পার থেকেই বুড়ী চীৎকার দিয়ে বুড়োকে একটা কাস্তে নিয়ে দৌড়ে আসতে বলল। বুড়ো কাস্তে নিয়ে এলে খুব সাবধানে ঠাকুরমা মাছটার পেট চিরে করমতিকে বের করে আনল। মাছের পেটে থেকে করমতির প্রায় মরমর অবস্থা। খানিক বাদে সুস্থ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে করমতি ঠাকুরমাকে সবকিছু বলে শোনাল। ঠকুরমার সব রাগ গিয়ে পড়ল খুমতির উপর। হতচ্ছারীকে আজ আচ্ছা সাজা দিতে হবে। করমতিকে আজ ও মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। ভাগ্যিস, এ সময় চান করতে এসেছিলাম নয়ত ওকে আজ মাছের পেটেই যেতে হত। নাতনির হাত ধরে ঠাকুরমা ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে বাড়ী নিয়ে এল।

বাড়ীতে পা দিয়েই বুড়ী খুমতিকে আর ছেলেকে বকতে লাগল। ছেলেকে ডেকে বলল —"আজ খুমতি হতচ্ছারী কি করে এসেছে জিজ্ঞাসা কর দিকিনি একবার। ভাগ্যিস, এ সময় আমি চান করতে গিয়েছিলাম — নয়তো করমতি আজ মরেই যেত।" যা যা হয়েছিল বুড়ী একে একে ছেলেকে সবকিছু বলে শোনাল। সবাই খুমতিকে বকতে লাগল। খুমতি ভয় পেয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে কাঁদতে লাগল।

মেয়ের কীর্তির কথা শুনে খুব রাগ হলেও খুমতির বাবা তখনকার মত চেপে গেল। মুখে একটি কথাও না বলে ওকে কঠিন সাজা দেবে বলে মনে প্রতিজ্ঞা করল। বাড়ীর সবাইকেও নিষেধ করে দিল কেউ যেন ওকে আর কিছু না বলে।

পরদিন রাত ভোর হতেই খুমতির বাবা এক গাদা বাঁশ এনে প্রকাণ্ড একটা খাঁচা বানাল। খাঁচাটা যেমনি মজবুত তেমনি বড়। ভেতরে একজন লোক স্বচ্ছন্দেই দাঁড়াতে পারে। খাঁচা বাঁধা শেষ হলে খুমতিকে ওর বাবা ডেকে এনে বলল —"ভেতরে ঢুকে দেখতো খুমতি, দাঁড়াতে পারিস কিনা! খুমতি এতটা বুঝতে পারেনি। ভেতরে ঢুকে দাঁড়াতেই ওর বাবা ঝটপট খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে ফেলল। ভয় পেয়ে খুমতি চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু বাবার মন তাতে একটুকুও নরম হল না। খাঁচার দরজাটা আরো ভাল করে বেঁধে শক্ত দড়ি দিয়ে খাঁচাটিকে উঠোনের উপরেই প্রকাণ্ড একটা গাছের উপরে ঝুলিয়ে রাখল। খাঁচার ভেতরে থেকে খুমতি কেঁদে কেঁদে বাবাকে অনেক মিনতি করে নামিয়ে দিতে বলল। মেয়ের কথা বাবা একবারটিও কানে তুলল না। বরঞ্চ তাকে বকতে লাগল — "হতচ্ছারী, তুই করমকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলি। তার সাজা তোকে পেতেই হবে। তোকে

না খেতে দিয়ে তিলে তিলে মারব। দেখি, তোকে কে বাঁচায়। খুমতির করুণ কান্নাতেও কেউ সাড়া দিল না।

খাঁচার ভেতরেই খুমতির দিন কাটছে। দিনে প্রচণ্ড রোদ্দুরে, রাতের হিম সবই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। একে একে মা, ঠাকুরমা, করম সবাইকে অনুরোধ করল। কিন্তু বাবার ভয়ে কেউ সাহস করে ওকে নামিয়ে দিতে এগিয়ে এল না। খিদেয় খাবার আর তৃষ্ণায় একবিন্দু জলও পেলনা খুমতি। যত দিন যেতে লাগল ক্ষুধা তৃষ্ণায় ততই কাতর হলে পড়তে লাগল।

সেদিন রাত ভোর হতেই বাড়ীর সবাই যে যার মত জুমের কাজে চলে গেল। ঘরদোর দেখতে রেখে গেল করমতিকে। সুযোগ বুঝে খুমতি করমতিকে ডেকে বলল "করম আমাকে একটু জল এনে দেনা বোন, তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তোর কাছে অপরাধ করে থাকিতো ক্ষমা করিস। করম কিন্তু দিদিকে সত্যি-সত্যিই ভালবাসত। বাবা মার চোখের আড়ালে দিদির জন্য লুকিয়ে কাঁদত। বাবার ভয়ে কিছুটি করতেও সাহস পেত না। সেদিন সুযোগ পেয়ে দু'টো 'মায়দুল' (ভাতের মোচা) ও এক চোঙা জল বাঁশের লম্বা একটা বাঁশের ডগায় বেঁধে খুমতির হাতে তুলে দিল। দেবার সময় করমতি বলে দিল —"দেখিস দিদি, খাবার দিয়েছি বলে কাউকে বলবি না যেন। তাহলে আমার দশাও তোর মতই হবে।" খুমতি বলল —"তা কি বলতে আছে বোন! আমার কপাল মন্দ বলে যে কষ্ট পাচ্ছি, সে কষ্ট তোকে কিছুতেই পেতে দেব না।

এদ্দিন পর গলা ভিজাতে পেরে খুমতি যেন প্রাণ ফিরে পেল। করমতিও এভাবে সবার চোখের আড়ালে মাঝে মাঝে খাবার তুলে দিয়ে দিদিকে বাঁচিয়ে রাখল। বাড়ীর আর কেউ এ কথা জানতে পারল না।

দুপুর বেলা বাড়ীর সবাই যখন জুমে চলে যায় — খুমতি তখন সুদূর নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যের আলোতে আকাশের দিকে চোখ ফেরাতে পারে না তবু আকাশের এক পাশে উড়ন্ত নাঐ পাখিদের দিকে চেয়ে চেয়ে ও ভাবত আমি যদি ওই পাখিদের মত নীল আকাশে উড়ে বেড়াতে পারতাম। ভগবান, তুমি আমাকে ওই পাখিদের মত উড়ে বেড়ানোর শক্তি দাও।

খুমতি খাঁচায় বসে রোজ এ সব ভাবে। কেন জানি একদিন, ওর অজান্তেই মুখ থেকে এক করুণ সুর বেরিয়ে এল। ও গান দুর আকাশের পাখীদের বলতে লাগল —

ওগো আমার নাঐ পাখী,
বারেক ফিরে চাও।
নীল আকাশে উড়তে সাধ;
পালক এনে দাও।

খুমতির করুণ বিলাপে নাঐ পাখীদের মন ভিজে গেল। দল বেঁধে নেমে এসে ওরা সবাই খুমতিকে এক একটি পালক দিয়ে গেল। খুমতি পালকগুলো খাঁচার এককোণে গুছিয়ে রাখল।

নিস্তব্ধ দুপুরে পরদিনও আবার খুমতি করুণ সুরে নাঐ পাখীদের আহ্বান করল।

ওগো আমার নাঐ পাখী,
আমায় নিয়ে যাও।
নাঐ পাখী হব আমি।
ঠোঁট এনে দাও।

খুমতির ডাকে আজও নাঐ পাখীরা সাড়া দিল। আজও ওরা নেমে এসে এক একটি ঠোঁট দিয়ে গেল। খুমতি সেগুলোও জমিয়ে রাখল।

পরদিন দুপুরে — আবারও খুমতি নাঐ পাখীদের ডাকল।

ওগো আমার প্রিয় নাঐ —
আমায় নিয়ে যাও;
নীল আকাশে উড়ব আমি
নখর এনে দাও।

এদিন নাঐ পাখীরা খুমতিকে এক একটি নখ দিয়ে গেল। খুমতি এগুলোও গুছিয়ে রাখল।

এবার খানিকটা সূঁচ সূঁতো চাই। বাবা তখন বাড়ী ছিলনা। খুমতি সৎমার কাছে একটি সূঁচ ও খানিকটা সূতো চাইল। সৎমা ওর কথা কানেই তুলল না। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। মার কাছে না পেয়ে মাসীর কাছে চাইল। মাসীও বলল "পিসির কাছে চেয়ে নাও" বলে চলে গেল। 'এ ওর কাছে চেয়ে নাও' বলে প্রত্যেকেই যে যার কাজে চলে গেল। এর মাঝে একদিন ঠাকুরমাকে একা পেয়ে মিনতি করে একটি সূঁচ ও খানিকটা সূতো দিতে বলল। ওর কাকুতি-মিনতিতে ঠাকুরমার মন কিছুটা নরম হল। ঠাকুরমা খুঁজে পেতে একটি ভাঙা সূঁচও খানিকটা সূতো এনে খুমতির হাতে তুলে দিলে।

সূঁচ-সূতো পেয়ে এত দুঃখের মাঝেও খুমতির কিছুটা আনন্দ হল। এবার সে জমিয়ে রাখা নাঐ পাখীদের পালক, নখ ও ঠোঁটগুলোকে জড় ঝরে সূঁচ-সূতো দিয়ে গেঁথে গেঁথে সুন্দর একটি নাঐ পাখীর পোষাক তৈরী করে ফেলল।

পোষাক বানানো হলে পর —একদিন দুপুরে সবাই তখন জুমের কাজে চলে গেছে, খুমতি পোষাকটি নিজের গাঁয়ে এঁটে পরখ করতে লাগল। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড।

পোষাকটি গাঁয়ে দিতেই কোত্থেকে যেন তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি এল। ঠিক যেন একটি নাঐ পাখী।

এবার খাঁচা থেকে বেরোনোর পালা। একদিন ভোরে খুমতি পোষাক এঁটে নাঐ পাখী হয়ে ঠোঁট নখ ও পাখা দিয়ে ঠুকরিয়ে, ঝাপটিয়ে আঁচড়ে খাঁচাটাকে ভেঙ্গে খান খান করে ফেলল। খুমতিকে আর কে বেঁধে রাখে! দু'পাখা নেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসল। মুক্তির আনন্দে মন তার নেচে উঠল। দু'পাখা নেড়ে থেকে থেকে বাড়ীর উপর উড়ে বেড়াতে লাগল। আর দূর আকাশের নাঐ পাখীদের ডেকে বলতে লাগল —

ওই আকাশে ক্ষণেক দাঁড়াও,
আমায় নিয়ে যাও।
উড়ে যাব নীল আকাশে,
ডানায় শক্তি দাও।

খুমতি খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে — পাখী হয়ে আকাশে উড়ছে। পাখিরূপী খুমতিকে দেখতে সবাই এসে উঠোনে জড় হয়েছে। খুমতির মা-বাবা আকাশের দিকে চেয়ে বার বার খুমতিকে ফিরে আসতে বলতে লাগল। খুমতি মা-বাবার কথায় সাড়া দিয়ে বলল আমাকে ক্ষিদেয় ক্ষেতে দাওনি, তৃষ্ণায় তোমাদের কাছ থেকে একবিন্দু জলও পাইনি — পেয়েছি শুধু বকুনি আর কর্কশ কথা। আজ আমাকে আর বেঁধে রাখতে পারবে না জেনেই কি ফিরে আসতে ডাকছ? নীল আকাশের পাখীরা তোমাদের চাইতে আমার কাছে অনেক বেশী আপন। আমি ওদের দলেই উড়ে যেতে চাই। করমকে মেরে ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না। কপাল মন্দ বলেই বোয়াল মাছ ওকে গিলে ফেলেছিল। তোমরা তা বুঝতে চেষ্টা করোনি।"

এবার করমতিকে উদ্দেশ করে বলল —"করম বোন, তোর কথা কখনো আমি ভুলতে পারব না। ক্ষিদেয় খাবার ও তৃষ্ণায় জল দিয়ে তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস্। তোর মঙ্গল হবে। ভাল ঘরে তোর বিয়ে থা হবে। তুই সুখী হবি! তুই হলুদ বরণ মেয়ে। তোর হলুদ বরণ দেহের ছোঁয়ায় নদীর জলও হলুদ হয়েছিল। তাই আজ থেকে সে নদীটির নাম হল "তীয় করম" বা "হলুদ বরণ নদী"।

খুমতির আহ্বানে দলে দলে নাঐ পাখীরা ওদের বাড়ীর উপর এসে উড়তে লাগল। এবার খুমতিও ওদের সাথে উড়ে যাবে। যাবার আগে করমতিকে শেষবারের মত ডেকে বলল "বোন, তুই ঘরে চলে যা"। আমি নীল আকাশে উড়ে গিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। খুমতির মা-বাবা সবাই সজল চোখে খুমতির পথের দিকে চেয়ে আছে। খুমতি উড়ে যেতে যেতে নাঐ পাখিদের বলল —